বিজ্ঞানসাধনার ধারায়

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

পূর্ণিমা সিংহ

বিজ্ঞানসাধনার ধারায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু

পূর্ণিমা সিংহ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪-১৯৭৪

ভূমিকা

বিশ্বের বিদ্যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার যে সার্থক অতিপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সেই ধারা সত্যেন্দ্রনাথকে চিরজীবন অনুপ্রাণিত করেছে। শিশু-কিশোরদের আর যাঁরা বিশেষভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষা করেন নি তাঁদের কাছে উপযুক্তভাবে সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব তুলে ধরতে সত্যেন্দ্রনাথের অক্লান্ত আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে বাংলায় লেখা অপূর্ব গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথকে অর্পণ করে জানিয়েছিলেন যে 'সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা' তাঁর মনে ছিল। তিনি মনে করতেন, 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।... যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।' কবি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিসংগত প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে ভাবাবেগ ও কল্পনায়-বিভোর বাঙালির চরিত্রে সত্যের সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট রূপকে আচ্ছন্ন করবার প্রবণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই শঙ্কিত ছিলেন। নানা লেখায় তা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের কাজ এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যের ভিত্তিহীন নানা অলীক কল্পনাপ্রসূত কিংবদন্তী লতাপল্লবিত হয়ে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই মানুষটি নিজের সম্বন্ধে জানাতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানসাধনার ধারার ইতিহাস রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। তাই যথাসাধ্য সত্যভাবে এই যুক্তিপ্রবণ মানুষটির বিজ্ঞানী চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র পরিসরে এই গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব অনুভব করেছি।

এই প্রচেষ্টায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় অসীম স্নেহপ্রবণ মাস্টারমশাই সত্যেন্দ্রনাথ

বন্ধুর কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি ঋণী। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর এবং গবেষণার ছাত্রী রূপে এবং তার পর ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে তাঁকে নানা পরিবেশে দেখার ও নানা আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছিল। সর্বদাই তিনি সহজ বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে টেপ রেকর্ড করা শুরু করেছিলাম। আলোচনা অসম্পূর্ণ রইল— অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা হল না।

আমাদের গবেষণাগারের গণিত এবং তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা থেকে রসায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ পরিবারের বিভিন্ন সহকর্মী— অগ্রজ অনুজের-সঙ্গে আলোচনার সূত্রে মাস্টারমশাই সম্বন্ধে অনেক ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

বর্তমানে আমেরিকা-প্রবাসী বন্ধুবর জগদীশ শর্মা আমার অনুরোধে অধ্যাপক Herman Mark -এর সঙ্গে আলোচনা করে টেপ পাঠিয়ে এবং আরো নানা ভাবে এ জীবনী রচনায় আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ঢাকা ও কলকাতায় মাস্টারমশাই-এর সহকর্মী, ছাত্র ও অন্যান্য নানা বন্ধু, তাঁর পরিবারের নানা জনে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছেন। এই-সব আলোচনার অনেক অংশ টেপ রেকর্ডে সংরক্ষিত করে এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছি।

বিশ্বভারতীর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন সহকারে পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সুচিন্তিত অভিমত ও উৎসাহ দান করেছেন। উক্ত বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক তপেন রায়, সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক অঞ্জন দাশগুপ্ত নানা আলোচনা করে প্রকাশভঙ্গির ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্য করেছেন। এমন দুরূহ প্রয়াস তবু ত্রুটিশূন্য হয় নি নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে জানার আরো অনেক বাকি রইল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সত্য ভাবে বোঝার আগ্রহ বাঙালি পাঠকদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মনে করব।

শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য চিত্রাঙ্কন করে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের আলোকচিত্রটি শ্রীগোপাল সান্যালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই গ্রন্থের পাঠ এবং বিন্যাসের বিষয়ে গ্রন্থনবিভাগের কর্মী শ্রীসুমিত মজুমদার নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, সে কথা এ উপলক্ষে বলা প্রয়োজন।

গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায়, বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মীদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পূর্ণিমা সিংহ

আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষার ফলে জানতে পেরেছেন যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদিতে আছে নানা রকম মৌল কণা। পদার্থ আর শক্তির নানা বিচিত্র গুণের মূলেও আছে এই মৌল কণাগুলি। এদের বিশেষ গুণ অনুযায়ী 'বোসন' (Boson) ও 'ফেরমিয়ন' (Fermion) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 'বোসন' আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর খুঁজে-পাওয়া নিয়ম মেনে চলে। সেই নিয়মেরই এক বিশেষ শর্ত মেনে-চলা রূপ খুঁজে পেয়েছেন ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফেরমি।

এই নিয়মগুলি তাপ, আলো ও নানা ধরনের শক্তি ও পদার্থের প্রকৃতি বোঝার এবং কাজে লাগাবার নানা পথ খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানীর নিজের বিশেষ বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি আর পরিশ্রম ছাড়াও এমন পথ-খুলে-দেওয়া কাজের পেছনে থাকে অনেক দিনের অনেক সন্ধানী পথিকের বুদ্ধি, অদম্য অনুসন্ধিৎসা আর প্রচেষ্টা। তাই একজনের সন্ধানের কথা বুঝতে গেলে আরো অনেকের কথা জানতে হয়।

২

বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা অনেকেই মনে করেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ শুরু হল সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo)-র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে। গ্যালিলিও নিজের হাতে টেলিস্কোপ বানিয়ে আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি দেখতেন। একটা ভারী ও হালকা জিনিস একসঙ্গে ফেললে কেমন ভাবে পড়ে, একটা ভারী জিনিস সুতোয় বেঁধে দুলিয়ে দিলে কেমন করে দোলে, একটা নুড়ি ঢালু জমিতে গড়িয়ে দিলে কেমন করে চলে, আলো কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এই-সব লক্ষ করে দেখতেন। ভাবতেন কিসের টানে গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে? কিসের টানেই বা দোলক দুলছে? যা-কিছু দেখতেন, ভাবতেন— সব লিখে রাখতেন।

তখনকার দিনে ধর্মযাজকরাই মানুষকে সব-কিছু শেখাতেন। তাঁদের কল্পনা করা জ্ঞান— তাঁদের পুঁথিতে-লেখা জ্ঞানের সঙ্গে গ্যালিলিওর নিজের চোখে দেখা ঘটনাগুলির অনেক কিছুই মিলল না। কারণ তখনকার দিনে যাঁরা জ্ঞানচর্চা করতেন, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতেন না। তাই ধর্মযাজকরা খুব চটে গেলেন। গ্যালিলিওকে তাই শেষ জীবন কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হল। কিন্তু নতুন জ্ঞানের পথ খুঁজে পাওয়া ছাড়াও গ্যালিলিও আর-একটা নতুন কাজ করেছিলেন। পণ্ডিতদের পুঁথির ল্যাটিন ভাষার বদলে সাধারণ ভাবে প্রচলিত নিজের মাতৃভাষা ইতালীয়তে তাঁর বইগুলি লিখেছিলেন যাতে দেশের বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে পারে। তাই ধর্মযাজকদের ছোটো গোষ্ঠীর বাইরে গ্যালিলিওর পাওয়া সত্যজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল ইতালীর বাইরেও ইউরোপের নানা জায়গায়।

১৬৪২ খৃস্টাব্দে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। সেই বছরই ইংলণ্ডে আইজাক নিউটন (Newton)-এর জন্ম হয়। তিনি ভবিষ্যতে গ্যালিলিওর পাওয়া জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হলেন। গ্যালিলিও যে-সব ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন নিউটন তা নিজেও আবার নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন আর অঙ্কের হিসাবের সূত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সারাজীবন আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। পদার্থের, আলোর গতিবিধির অনেক নতুন নিয়ম খুঁজে পেলেন। বিজ্ঞানের নানা দিকে পাওয়া এই-সব খবর ১৬৮৭ খৃস্টাব্দে তাঁর লেখা বিখ্যাত বই 'প্রিন্সিপিয়া' (*Principia*)-তে ছাপা হল। তার পর থেকে ক্রমাগতই নানা দেশে নানা জনে এই পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু গ্যালিলিও, নিউটন কি হঠাৎ উদিত হলেন?

অনেক অনেক দিন আগে দলে দলে মানুষ সারাদিন ঘুরে বেড়াত খাবারের সন্ধানে ফলমূল কুড়িয়ে, ভয়াবহ জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে সাবধানে প্রাণ বাঁচিয়ে। হিংস্র জন্তুদের মতো তাদের দাঁত নখের জোরও ছিল না, হরিণের মতো দৌড়ে কিংবা বাঁদরের মতো লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে পালাতেও পারত না। তাদের শক্তি

ছিল দল বেঁধে থাকার শক্তি, মাথায় একটু বেশি বুদ্ধি আর হাতের আঙুলগুলি মুড়ে ভালো করে জিনিসপত্র ধরার ক্ষমতা। তারা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে জীব-জন্তু তাড়িয়ে দিত কিংবা মেরে খেত। রাত্রে গুহা বা কোনো নিরাপদ জায়গায় দল বেঁধে ঘুমিয়ে থাকত।

কখনো বনে জঙ্গলে আপনা থেকেই আগুন ধরেছে, মানুষ অবাক হয়ে দেখেছে। ক্রমে নানা রকম পাথর ঘষে ঘষে তারা অস্ত্র বানাতে শিখল। এমনি ভাবে পাথরের ঘষায় হঠাৎ একদিন দেখল আলোর ঝলক। আগুন জ্বলল— অবাক হয়ে ভাবল 'আমি নিজে নিজে এমন একটা নতুন জিনিস তৈরি করলাম!'

মানুষের নিজের চেষ্টায় আগুন জ্বলল। সমস্ত গুহা আলোয় ভরে গেল, ঠাণ্ডা গুহা গরম হল। শুকনো ডালপাতা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কি করে আলো হল? কি করে তাপ হল? সূর্য উঠলেও তো এমনি আলো আর তাপ আসে। সে আলোই বা কেমন করে আসে? রাত্রে সূর্য কোথায় যায়?— এমনি সব নানা প্রশ্ন হয়তো ঝাপসা ভাবে মনে ঘুরে বেড়ায়, তার পর ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হলেই আবার খাবারের সন্ধানে বেরোতে হয়।

এই জানার ইচ্ছে থেকেই বিজ্ঞানের শুরু। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন নিজের খুঁজে পাওয়া জ্ঞান পরের যুগের মানুষের জন্য রাখতে শিখল। ধীরে ধীরে নানা দেশে নানা কালে গ্রাম শহর বানিয়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। কখনো কোনো জায়গায় এই ইচ্ছে বেড়ে উঠেছে, কখনো-বা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এক সময়ে ভূমধ্যসাগরের পাশের উর্বর জমি ঘিরে যারা বাস করত তারা অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল। মাটি খুঁড়ে পুরনো যুগে তাদের তৈরি নানা জিনিস থেকে এ কথা বোঝা যায়।

তার পর একসময় ভারতবর্ষ, চীন ও গ্রীসে সব চেয়ে ভালো ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলছিল। ইউরোপের বেশির ভাগ অংশে ছিল তখন অন্ধকার যুগ। নানা কারণে এ-সব প্রাচীন সভ্যতার পতন হল। অনেক কারণের মধ্যে জ্ঞান-

চর্চার পতনের একটা প্রধান কারণ হল পণ্ডিতগোষ্ঠীর জনসাধারণের ওপর প্রভুত্ব করা আর হাতের কাজকে বুদ্ধির কাজের থেকে নিচু মনে করা।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার— এই-সব নানা সূত্রে যোগাযোগের ফলে এক জায়গার মানুষের পাওয়া জ্ঞান অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। রোমানরা গ্রীস জয় করল, তার পর রোমেরও পতন হল। মধ্য প্রাচ্যে মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর আরবরা ইউরোপের কিছু অংশ, আফ্রিকার কয়েক জায়গা আর ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চল জয় করল। আরবরা ভারত, গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন ও চিকিৎসা -শাস্ত্র অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেছে আর নিজেরা আরো জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। তার পর আরব সভ্যতারও পতন হল।

একাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আবার প্রথমে ইতালীতে আরব-বিজ্ঞানের ল্যাটিন অনুবাদ শুরু হল। ক্রমশ ইউরোপের নানা জায়গায় বিজ্ঞানচর্চার নব জাগরণ হল। নানা জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যন্ত্রবিপ্লব বা কারিগরি ও যন্ত্রপাতি তৈরির বিরাট উন্নতি ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে গেল।

আলো কি ভাবে তৈরি হয়? কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে?— এই পুরনো প্রশ্ন মানুষ বিভিন্ন যুগে বার বার ভেবেছে, এখনো ভাবছে। ক্রমাগত বেশি করে জানছে বুঝছে। শুধু পাথরের অস্ত্র নয়, ভূ-পৃষ্ঠের নানা বস্তু থেকে লোহা, তামা, পিতল, কাচ— এই-সব নানা জিনিস নিজে তৈরি করে তারই সাহায্যে নানা রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করছে। নিজের হাতে পরখ করে দেখছে, মাপছে, ভাবছে আর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে দেখে অঙ্ক কষে ব্যাখ্যা করছে।

সূর্য সম্বন্ধে মানুষের বিস্ময়ের সীমা নেই। সূর্যের সাদা আলো মেঘলা দিনে জলকণায় পড়ে সাতরঙা রামধনু তৈরি করে। মানুষের তৈরি কাচের প্রিজ্‌ম্-এর ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো পাঠালেও রামধনুর মতো লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ঘননীল, বেগুনী— পর পর এই-সব রঙে ভাগ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এর

নাম দিলেন সূর্যের স্পেকট্রাম বা বর্ণালী। মানুষ সাদা চোখে সাদা আলোয় মিলিয়ে থাকা যে রঙগুলি দেখতে পায় নি কাচ বা জলকণা তাদের বিশেষ গুণের ফলে তা দেখিয়ে দিল।

দেখা গেল বর্ণালীর লালের দিকের এপারে চোখে দেখার মতো আলো না থাকলেও তাপ মাপার যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় তাপের রশ্মি আসছে। এই রশ্মির নাম দেওয়া হল ইনফ্রা-রেড (infra-red)। বেগুনীর ওপারে ফোটোগ্রাফিক প্লেট রেখে দেখা গেল অদৃশ্য কোনো রশ্মি আলোর মতোই ফোটোপ্লেটকে কালো করছে। তার নাম হল আলট্রা-ভায়োলেট (ultra-violet)। এমন আরো রশ্মির কথা সকলেই এখন জানে— যার নাম একস্-রে (x-ray), যা মানুষের শরীর ভেদ করে হাড়ের ছবি দেখায়। যাই হোক, বোঝা গেল সূর্যের বর্ণালীর সব খবর পাবার জন্য শুধু চোখের ওপর ভরসা করলেই চলবে না— চেষ্টা করে আরো যন্ত্র তৈরি করতে হবে।

আলো কি ভাবে নানা জিনিসের ভিতর দিয়ে চলে যায়, কি ভাবে বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে, কোন্ জিনিস আলো কতটা শুষে নেয় এ-সব নানা গুণ পরীক্ষা করে দেখা শুরু হল। একটা বস্তুকণা কত জোরে ছুঁড়লে তা কি ভাবে চলবে, অন্য জিনিসে ধাক্কা লেগেই বা তার চলার পথ কি ভাবে বদলাবে— এ-সব নিয়ম নিউটন খুব নিপুণভাবে দেখেশুনে বুঝেছিলেন। নিউটন ভাবলেন আলো এক রকম সূক্ষ্ম কণা যা সরল রেখায় চ'লে কোনো জিনিসের ওপর ধাক্কা লেগে চার দিকে ছিটিয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলে আমরা জিনিসটা দেখতে পাই। কণা স্বভাবের ভিত্তিতেই আলোর তখন পর্যন্ত দেখা নানা ব্যবহারের মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

তার পর ইয়ং (Young), ফ্রেনেল (Fresnel) ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে খুব সূক্ষ্ম ব্যবধানে রাখা দুটো সূক্ষ্ম রেখার ছিদ্রপথে আলোর রশ্মি পাঠালে ছিদ্রের ওপারে সাদা পর্দার ওপর পর পর সমান দূরত্বে সূক্ষ্ম আলোছায়ার রেখা দেখা যায়। আলোর কণা দুই ছিদ্রপথে একের ওপর এক এসে পড়লে তো

আলো আরো জোরদার হবে। আলোয় আলোয় মিলে মাঝে মাঝে ছায়া হল কী করে ?

এমন আলো-ছায়ার নকশা হতে পারে যদি চলার পথে নিয়মিত তালে আলোর এমন কোনো গুণের পরিমাণ বাড়ে কমে যার ওপর আলোর জোর নির্ভর করে। তার মানে আলো এক ধরনের সূক্ষ্ম ঢেউ খেলিয়ে চলে। পর্দার ওপর কোনো জায়গায় দুই ছিদ্রপথে আসা আলো যদি একের চেয়ে অপরে একটু বেশি পথ অতিক্রম করে পৌঁছয় যাতে এক রশ্মির ঢেউয়ের চূড়া অপর রশ্মির ঢেউয়ের খাদের ওপর পড়ে, তবে কাটাকাটি হয়ে আলোর পরিমাণ হবে শূন্য। আর কোনো জায়গায় যদি দুই রশ্মি একই অবস্থায় এসে মেলে অর্থাৎ চূড়ার ওপর চূড়া এবং খাদের ওপর খাদ পড়ে তবে সেখানে দুয়ের যোগফলে আলো হবে আরো জোরদার। এমনি করেই নকশা তৈরি হবে (চিত্র ১ ক ও খ)। দুটি ছিদ্রের
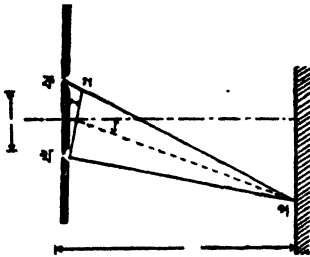
কখ : সূক্ষ্মরেখা ছিদ্রপথ

কগ : কপ ও খপ দুই-আলোর পথের ব্যবধান। খ ও গ-তে আলোর তরঙ্গ এক অবস্থায় থাকলে প বিন্দুতে আলো থাকবে, বিপরীত অবস্থায় থাকলে ছায়া থাকবে।

(চিত্র ১ ক)
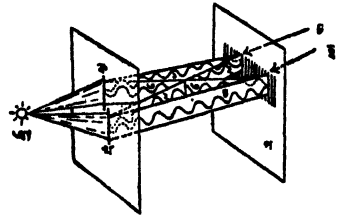
আ : আলোর উৎস

কখ : সূক্ষ্ম ব্যবধানে রাখা আলোর রেখার ছিদ্রপথ

চ : উজ্জ্বল আলোর রেখা

ছ : ছায়ার রেখা

প : পর্দা

১, ২, ৩, ৪ : আলোর গতিপথ

(চিত্র ১ খ)

ব্যবধান, পর্দার দূরত্ব আর নকশার মধ্যে পর পর উজ্জ্বল অথবা কালো রেখার দূরত্ব মেপে আলোর ঢেউয়ের পর পর দুটি চূড়ার মধ্যে দূরত্ব মাপা যায়। এই মাপকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলা যাক। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবশ্য খুবই ছোটো। এক সেন্টিমিটারের ১০০,০০০ ভাগের কাছাকাছি। ছিদ্রের মাপ এই মাপের কাছাকাছি হলেই আলোর মেশামেশিতে তৈরি আলো-ছায়ার নকশা দেখা যায়। নিউটনের কণাবাদের ভিত্তিতে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না।

সূর্যের বর্ণালীর নানা অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মেপে দেখা গেল লালের দিকে আলোর তরঙ্গ নীলের দিকের চেয়ে বেশি লম্বা। লালের এপারে ইনফ্রা-রেড, তাপ, রেডিয়ো-তরঙ্গ ক্রমশ বেশি লম্বা আর বেগুনীর ওপারে আলট্রা-ভায়োলেট, এক্স-রে, গামা-রে (γ-ray) এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমে গেছে। তাপ আমরা স্পর্শ করে বুঝি, আলো কোনো বস্তুতে পড়লে যে প্রভাব সৃষ্টি করে চোখে দেখে তার লাল নীল ইত্যাদি নাম দিয়েছি, এক্স-রে বস্তুতে পড়ে সোজাসুজি চোখে দেখার মতো প্রভাব সৃষ্টি করে না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সব কিছুকেই বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ বলা হয়।

কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করতে হলে একটা উৎসতে একটা নিয়মিত তালে দোলা সৃষ্টি করতে হয়। যেমন পুকুরের জলের মাঝখানে একটা নুড়ি ছুঁড়ে ফেললে জলের কণাগুলি তালে তালে দুলিয়ে দেয়। সেই দোলন বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে পুকুর-পারের দিকে। প্রথমে নাড়ানো জলকণাগুলি পারের দিকে যায় না— প্রত্যেক জল-কণা তার পাশের জলকণাতে দোলন সঞ্চালিত করে দেয় 'কানাকানি' খেলার মতো। বিকিরণের গতিবেগ সমান থাকলে, দ্রুততালে কাঁপলে, এক সেকেণ্ডে বিকিরণ যতদূর যাবে তার মাঝে অনেকগুলি তরঙ্গ তৈরি হবে, সেইজন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছোটো হবে। ঢিমে তালে কাঁপলে তরঙ্গগুলি বড়ো বড়ো হবে। তাপের চেয়ে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম, তার মানে কাঁপনের হার বেশি। কাঁপনের হার বা কম্পনাঙ্ককে সাধারণত গ্রীক অক্ষর ν (নিউ) নাম দিয়ে বোঝানো হয়।

আলো কিসের তরঙ্গ? বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন। ক্রমে অনেক পরীক্ষার পর বোঝা গেল কম্পনাঙ্কর দুই বিশেষ সীমার মধ্যে তালে তালে বিদ্যুতের জোর বাড়া-কমার দোলনই আলোর তরঙ্গ। লালের দিকে কম্পনাঙ্ক কম, নীলের দিকে বেশি।

বিদ্যুতের জোর যদি ওপর নীচ মুখে তালে তালে কাঁপে তবে তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে সেই তালে চুম্বকের টানের কাঁপন হয়। যদি একটা কার্ডবোর্ডে লোহাগুঁড়ো ছড়িয়ে তার মাঝে গর্ত করে খাড়াভাবে ইলেকট্রিক তার ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো যায় তবে লোহাগুঁড়োগুলো এমন ভাবে সার বেঁধে জড়ো হবে যেন গর্তের মুখে চুম্বকের মেরু রাখা আছে। তার মানে চলন্ত বিদ্যুৎ তার সঙ্গে লম্বভাবে রাখা সমতলে একটা চুম্বক প্রভাব তৈরি করে।

বিদ্যুৎ তালে তালে এক জায়গায় কাঁপছে আর চার দিকে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে তার প্রভাব— পরস্পর-লম্বভাবে বিদ্যুৎ আর চুম্বক প্রভাবের কাঁপন। এই শূন্যে বিদ্যুৎ নেই কিন্তু বিদ্যুৎ বা চুম্বক রাখলে উৎসর কাঁপনের তালে কাঁপবে। উৎসর আশপাশের শূন্যস্থানের এই গুণকে বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্র বলা হয়, এই ক্ষেত্রের তীব্রতার তালে তালে কাঁপনই হল বিকিরণ। তাই তাপ, আলো এই-সব বিকিরণকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বলা হয়। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলোর মিলিত তরঙ্গ-গুণকে কয়েকটা সুন্দর অঙ্কের সূত্রে বাঁধলেন যা দিয়ে আলোর গতিবিধির সব-কিছুর নিখুঁত হিসেব করা সহজ হল।

বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করার জন্য তো বিদ্যুতের কাঁপার দরকার। সে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? কাঠ, কয়লা, তামা, লোহা— এ-সব গরম করলে আলো তৈরি হয়। তবে এ-সবের ভেতরেই বিদ্যুৎ আছে। ঠিক তাই। যে-কোনো জিনিস ভাঙতে ভাঙতে শেষ কালে যে-সব সূক্ষ্ম কণায় এসে পৌছয় তাদের পরমাণু বলা হয়। পরমাণু আবার পজিটিভ আর নেগেটিভ দু রকম বিদ্যুৎ কণা দিয়ে তৈরি। নেগেটিভ কণাকে ইলেকট্রন বলা হয়। বস্তুর ভেতরের ইলেকট্রনকে বাইরে থেকে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি দিয়ে কাঁপালেই আলোর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি হয়, বিজ্ঞানীদের এই রকম ধারণা হল।

নানা রকম পরীক্ষা করে আর তার সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্ক করে বিজ্ঞানীরা আলোর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ স্বভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বিভিন্ন শাখায় নিউটনের অক্লান্ত কাজের পর ইউরোপের নানা জায়গায় বিজ্ঞানচর্চার কাজ শুরু হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী— বিশেষ করে বের্লিন, বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল। বের্লিনে নানা বিজ্ঞানী পরীক্ষা আর চিন্তা করে যে-সব খবর আর নিয়ম খুঁজে পেতেন বের্লিন অ্যাকাডেমিতে জড়ো হয়ে সবাই মিলে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। সবাই চাইত সব-কিছু আরো ভালো করে বুঝব— সবাই মিলে ভাবব যাতে একজনের পাওয়া খবর আর-এক জনের মাথায় নতুন চিন্তা আনে। ভাব আদানপ্রদান করেই বিজ্ঞানের কাজ হয়— একার দ্বারা চলে না। অনেক কষ্টে একটু একটু করে মানুষ বুঝছে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন।

১৮৫৯ খৃস্টাব্দে বের্লিন অ্যাকাডেমিতে বিজ্ঞানী কারশফ্ (Kirchoff) একদিন বললেন, "সূর্যের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমি বিকিরণ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম খুঁজে পেয়েছি : একই তাপমাত্রায় একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির বিকিরণ ছড়িয়ে দেবার আর শুষে নেবার ক্ষমতার অনুপাত সব বস্তুর ক্ষেত্রে সমান হবে।"

গরমকালে কালো জামা পরলে বেশি গরম লাগে তার মানে কালো জিনিস বেশি করে তাপ টানে। কারশফ্ 'আদর্শ কৃষ্ণবস্তু' বা সংক্ষেপে 'কৃষ্ণবস্তু' বলে একটা কল্পনা করলেন যার ওপর যে-কোনো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর বিকিরণ পড়লে শুষে নেবে আর যা গরম করতে থাকলে ক্রমশ সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর বিকিরণ ছড়িয়ে দেবে। এমন জিনিস তৈরি করতে পারলে ঘরে বসেই সব রকম বিকিরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা যাবে। কারশফ্ বললেন যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা চার দিকে দেয়াল-ঘেরা গহ্বরের ছিদ্র একটা আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর মতো ব্যবহার করবে। কারশফের অনুমান-অনুযায়ী লুমার (Lummer) এবং হ্বীন (Wien) তেমনি

আবদ্ধ পাত্র তৈরি করে কারশফের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিলেন।

আমেরিকার বিজ্ঞানী ল্যাঙ্‌লে (Langley) আবার এই সময়ে সূর্যের বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে তাপের পরিমাণ মাপার ইচ্ছেতে বোলোমিটার বলে একটি অত্যন্ত উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি করলেন। এই যন্ত্রর সাহায্যে অনেক বিজ্ঞানী 'কৃষ্ণ-বস্তু'র বর্ণালী বিশ্লেষণের কাজ শুরু করে দিলেন। তাপ বিকিরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কারশফের তাত্ত্বিক চিন্তা আর ল্যাঙ্‌লের বোলোমিটার তৈরি— দুই-ই সূর্য-কিরণের প্রকৃতি অনুসন্ধানের ইচ্ছে থেকে হয়েছে। তাত্ত্বিক আর পরীক্ষামূলক গবেষণা দেশের সীমা ছাড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে।

আজকে আমাদের দেশে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করে দেখাচ্ছে আর প্রকৃতির নানা নিয়ম ব্যাখ্যা করছে। অনেক দিন ধরে নানা দেশের অনেকের চেষ্টায় এমন অবস্থা এসেছে।

কারশফের বক্তৃতা যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক (Planck)। কারশফের সূত্র প্লাঙ্ককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কারণ বস্তুর নিজস্ব গুণের ওপর নির্ভর করে না এমন একটা নিয়ম থেকে নিশ্চয়ই বিকিরণের নিজস্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো মূলগত জ্ঞান পাওয়া যাবে বলে তাঁর মনে হল। তিনি তাপ, আলো, বিকিরণ সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করতে শুরু করলেন।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে গরম করতে করতে যে-কোনো একটা তাপমাত্রায় স্থির হবার পর 'কৃষ্ণবস্তু' থেকে যে বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে তাতে সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ সমান জোরদার হয় না। অনেক পরীক্ষা করে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বর্ণালীতে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শক্তি কি ভাবে ভাগ হচ্ছে ভীন তার একটা নিয়ম খুঁজে পেলেন। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গেই বা কি ধরনের পরিবর্তন হয় তাও দেখে ভেবে বের করলেন। দেখা গেল যে কোনো তাপমাত্রায় মাঝামাঝি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ সব চেয়ে বেশি জোরদার। বেশি আর কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের জোর কম। যেমন, চোখে-দেখা আলোর বর্ণালীর ওপর জোর মাপার

যন্ত্র দিয়ে মাপতে থাকলে দেখা যায় হলুদ-সবুজ রঙের আলোর জোর বেশি, তার দু দিকে বড়ো মাপের তরঙ্গ লালের দিক আর ছোটো মাপের তরঙ্গ নীলের দিকের তেজ ক্রমশ কমে গেছে। তার মানে আলোর উৎসতে হলুদ-সবুজ বিকিরণ সৃষ্টির উপযুক্ত তালে যারা কাঁপছে, অর্থাৎ সেই তালের 'স্পন্দক' (oscillator) বেশি পরিমাণে আছে। এই খবরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা অঙ্কের সূত্র তৈরি
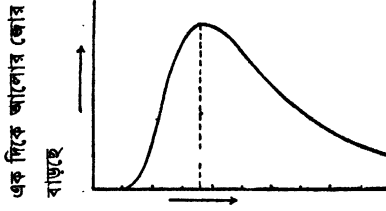
তীর চিহ্নিত দিকে দৈর্ঘ্য বাড়ছে।

(চিত্র ২'ক)

হল যাকে হ্বীনের সূত্র বলা হয় (চিত্র ২ক)। চিত্রে বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর সঙ্গে বর্ণালীতে আলোর জোর বাড়া-কমার কেমন নিয়ম তার ছবি দেওয়া হল। শুধু চোখে-দেখা আলোর জন্য নয়— সব রকম বিকিরণের জন্যই এমন চিত্র পাওয়া যাবে। তাপমাত্রা বাড়ালে রেখাচিত্রটা বাঁ দিকে— অর্থাৎ নীলের দিকে সরে যাবে। বিকিরণের সব চেয়ে জোরালো মাপটাও বাঁ দিকে সরে যাবে। আলট্রা-ভায়োলেট এলাকায় ছবি এঁকে দেখলেও এমনি মাঝামাঝি জায়গায় চূড়াওলা চিত্রই আঁকতে হবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর সঙ্গে আলোর জোরের পরিমাণের মাপ দেখাতে। তাপমাত্রা কমাতে থাকলে তেমনি সমস্ত চিত্রটিই ডান দিকে সরে ক্রমশ লাল পেরিয়ে যাবে (চিত্র ২খ)।
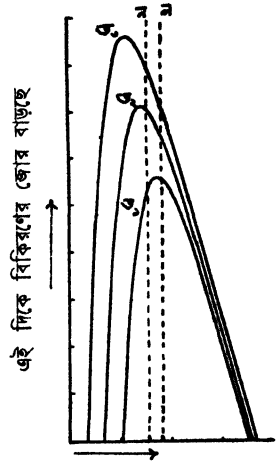
এই দিকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়ছে

ত১, ত২, ত৩: ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা

ন, ল : চোখে-দেখা আলোর অংশ

(চিত্র ২ খ)

কোনো কিছু যদি আর-কিছুর সঙ্গে একটা নিয়ম মেনে বদলায় তবে আমরা নিয়মটা জানলে তার উপযুক্ত অঙ্কের সূত্র তৈরি করতে পারি। আর তা ব্যবহার করে অন্যান্য তথ্য জানতে পারি। নিয়ম সহজ হলে অঙ্ক তৈরি সহজ হয়। যেমন ধরা যাক, যদি রাম যতদূর দৌড়য় শ্যাম যদি সব সময় তার দ্বিগুণ দৌড়য় তবে: শ্যামের দৌড়ের মাপ $= 2$ (রামের দৌড়ের মাপ)।

যে-কোনো সময়ে রামের দৌড় মেপে 2 দিয়ে গুণ করলেই শ্যাম কতদূর দৌড়বে জানা যাবে। কিন্তু যদি প্রথম পাঁচ মিনিট শ্যাম 2 গুণ দৌড়য় তার পরের পাঁচ মিনিট 3 গুণ, তার পর সমান বেগে যায়, তার পর শ্যামের দৌড় 2 ভাগ কমে যায়— এমনও তো হতে পারে। তবে অঙ্ক তৈরি কঠিন হয়ে পড়বে। বুদ্ধি খেলাতে হবে। এমনি নানা রকম গোলমেলে সম্পর্ক প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। জানা বা মেপে দেখা জিনিসের সঙ্গে অজানা জিনিসের সম্পর্ক বা সমীকরণ গড়ে তুলে পদার্থবিজ্ঞানে নানা রকম অজানা ভেতরের খবর বের করা যায়। 'কৃষ্ণ-বস্তু'র বর্ণালীতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে শক্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার নিয়ম নিখুঁত ভাবে বের করা আর তার সঙ্গে থাপ খাওয়ানো সূত্র তৈরি করা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনেক বিজ্ঞানী এই নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকলেন। কারণ এর থেকে বিকিরণের মূলগত তত্ত্ব খুঁজে পাবার সম্ভাবনা আছে বলে সকলে ভাবছিলেন।

অণু-পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদি বস্তুকণার কাঁপনের জন্যই নানা ধরনের বিকিরণ তৈরি হয় বলে ভাবা হল। কিন্তু তাদের তো বাইরে থেকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না! কত-সংখ্যক কণা কি বেগে চলছে, কি তালে দুলছে, কি ভাবে জানা যাবে? তার সঙ্গে বর্ণালীর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত শক্তিই বা কি ভাবে জড়িত?

অনেক মানুষের ভিড় হাওড়া স্টেশনে নানা দিকে ছুটছে— তাদের আলাদা করে সকলের খবর জানা সম্ভব হয় না, কিন্তু মোটামুটি কতজন প্রতিদিন কোন্ দিকে যায় তার গড়পড়তা হিসেব অনেক কাজে লাগে। তার জন্য যে

ধরনের অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তার নাম স্ট্যাটিস্টিক্স বা সংখ্যাতত্ত্ব। গ্যাসের পরমাণুর গতিবিধির নিয়ম-কানুন থেকে গ্যাসের তাপ-চাপের খবর বোঝার চেষ্টায় ম্যাক্সওয়েল ও বোল্ট্‌জ্‌মান (Boltzmann) এক ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স প্রয়োগ করেছিলেন। হ্বীনও এই গণনা-পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর সূত্র তৈরি করলেন।

প্লাঙ্ক হ্বীন-পদ্ধতির সঙ্গে বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের ধারণা মিলিয়ে একটা পদ্ধতি তৈরি করলেন। দুই বিজ্ঞানী র‍্যালে (Rayleigh) ও জীন্‌স্ (Jeans) অন্য আর-এক ভাবে হিসেব করে হ্বীনের চেয়ে অন্য এক রকম নিয়ম পেলেন। দেখা গেল হ্বীনের নিয়ম বর্ণালীর সব জায়গায় মিলছে না। র‍্যালে-জীন্‌স্ -এর সূত্র কয়েক জায়গায় মিললেও প্রধানত মেলে না। তার মানে নিশ্চয়ই পদ্ধতি ও কল্পনায় গলদ আছে। রুবেন্‌স্ (Rubens) খুব যত্ন করে মাপজোখ করে বললেন তবু বর্ণালীর কিছু অংশের চরিত্র ঐ সূত্রের সঙ্গে মেলে বটে। প্লাঙ্ক এই-সব তথ্য একসূত্রে মেলাবার জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। এ বিষয়ে কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা এইভাবে একে অপরের সাহায্য নিয়ে ক্রমাগত ভাবছেন আর নতুন-পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ক্রমশ সঠিক পথের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানী কারো তত্ত্বকথা মানবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা করে দেখা খবরের সঙ্গে সে কথা খাপ খাবে।

অবশেষে ১৯০০ সালের ২৫ অক্টোবর প্লাঙ্ক বের্লিন অ্যাকাডেমিতে এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ পেশ করলেন। 'আদর্শ কৃষ্ণবস্তু'র বর্ণালীতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে শক্তির বণ্টনের সব অংশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এক সমীকরণ দিলেন— আট সপ্তাহ অক্লান্ত খাটুনির পর। এই সমীকরণ পাবার জন্য আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার এক আমূল পরিবর্তন কল্পনা করতে হল।

যে-কোনো তালে কাঁপনের আলো একটানা জলের ঢেউয়ের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে যাবে এই যে ধারণা ইয়ং, ফ্রেনেল, ম্যাক্সওয়েলের কাজের ফলে গড়ে উঠেছিল দেখা গেল সেটা আর পুরোপুরি টিঁকছে না। বিচ্ছিন্ন ঝলকে ঝলকে

আলোর শোষণ ও বিকিরণ হয় বলে ভাবার দরকার হল। নিউটনের কণার ধারণা আবার নতুনভাবে ফিরে এল। কিন্তু এ কণা নিউটনের কল্পিত সাদাসিধে কণা নয়। এর মধ্যে তালে তালে কাঁপার ছন্দও নিহিত থাকবে। আমরা যাকে আলোর কাঁপার হার বা কম্পনাঙ্ক ν নাম দিয়েছি এই কণাগুলির শক্তি হবে তার h গুণ। h একটা খুব ছোটো ধ্রুব-সংখ্যা, $\left(\frac{6{\cdot}56}{\text{1 -এর পর 27টা শূন্য}}\right)$ আর্গ-সেকেণ্ড (erg-second)[১] যাকে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়। অর্থাৎ ν তালের আলো $1h\nu$, $2h\nu$, $3h\nu$ এই-সব শক্তি নিয়ে বেরোতে পারবে— এদের মাঝামাঝি কোনো শক্তি সম্ভব হবে না। এই কণাগুলিকে কোয়াণ্টাম বলা হয়। নদী বয়ে যাচ্ছে; গেলাস, ঘটি, বালতি— যে-কোনো মাপে জল তুলতে পারি। আমি একটা, দুটো, তিনটে জল তুলছি বলব না। কিন্তু নদীর ধারে ছড়ানো নুড়ি কুড়োতে গেলে আমাকে বলতে হবে একটা, দুটো বা তিনটে তুলছি। তরঙ্গ ও কণা -প্রকৃতির এই তফাত। নুড়িতে নুড়িতে ধাক্কা লেগে যে ভাবে শক্তির আদান-প্রদান হয়— অনেক পরীক্ষাতে আলোর তেমনি গুণের প্রকাশ দেখা গেল। কিন্তু আলোর উৎপত্তি তালে তালে 'স্পন্দক'-এর কম্পনের ফলে হয় এ ধারণা প্লাঙ্ক বর্জন করলেন না।

প্লাঙ্ক কল্পনা করেছিলেন আলো ব্যাপারটা পরমাণুর কাঁপনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে নয়, ধাপে ধাপে। আলোর বিকিরণের শক্তির একটা নিম্নতম মান আছে যাকে বিভিন্ন পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে শক্তি পাওয়া যাবে সেই-সব মাপেই শক্তি নির্গত হবে। তার মাঝামাঝি কিছু সম্ভব নয়। প্লাঙ্ক শুধু শক্তি বিকিরণ আর শোষণের পদ্ধতি কল্পনা করেছিলেন। ভেবেছিলেন এই দুটি ঘটনা পূর্ণ সংখ্যার মাপে ঘটে থাকে। কিন্তু আলোর নিজস্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন কল্পনা করেন নি। তিনি তখনো পুরনো নিয়ম-অনুযায়ী ভাবছিলেন যে আলো এক রকম তরঙ্গ আর তার চলার জন্য ইথার বলে এক রকম উপযুক্ত গুণ-

১ আর্গ সি.জি.এস. পদ্ধতিতে শক্তির একক।

সম্পন্ন মাধ্যম দরকার যা সমস্ত শূন্যস্থান ব্যাপ্ত করে আছে বলে কল্পনা করা হয়। যেমন শব্দের ঢেউ চলার জন্য বাতাস কিংবা কোনো তরল বা কঠিন বস্তু প্রয়োজন হয়।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা আর-একটি ঘটনা লক্ষ করেছিলেন, প্রচলিত আলোর তরঙ্গরূপের সঙ্গে যার সংগতি পাওয়া যায় না। কোনো ধাতুর পাতের ওপর আলো ফেললে তার থেকে শক্তি নিয়ে ধাতুর ভেতরের ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এই ব্যাপারকে বলা হয় 'ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট' বা ইলেকট্রনের ওপর আলোর প্রভাব।

বিজ্ঞানী লেনার্ড (Lenard) দেখলেন যে ধাতুর বাঁধন মুক্ত হয়ে যে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে তার শক্তি আলোর তীব্রতা বা জোরের ওপর নির্ভর করে না— আলোর রঙ অর্থাৎ কম্পনাঙ্ক (ν)-র ওপর নির্ভর করে। এক রঙের আলো ধাতুর পাত থেকে যত দূরেই রাখা হোক অর্থাৎ যত কম আলোই ধাতুতে পড়ুক, ইলেকট্রন একই গতিতে বেরিয়ে আসবে। যদিও কম আলো পড়লে ইলেকট্রন সংখ্যায় কম বেরোবে। কিন্তু ইলেকট্রন বেরোবার গতি জোরদার লাল আলোর চেয়ে ক্ষীণ বেগুনী আলোর ক্ষেত্রে বেশি হবে।

আইনস্টাইন (Einstein) ভাবলেন একটা বিশেষ রঙের আলো যত দূরেই থাক্ তাতে এক রকম শক্তিসম্পন্ন কণা থাকবে। একমাত্র তফাত হবে এই যে যত দূরে থাকবে, উৎস থেকে বুলেটের মতো যে শক্তিকণাগুলি বেরোবে তা চার দিকে ছড়িয়ে যাবে— তাই কম সংখ্যায় ধাতুর পাতে এসে পড়বে। একটা পূর্ণ শক্তিকণা শুষে নিলেই ধাতু থেকে ইলেকট্রন বেরোবে। এই যুক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে উৎস থেকে ধাতুতে আলো পড়লে কেন তার দূরত্বের ওপর নির্গত ইলেকট্রনের গতিবেগ নির্ভর করে না। এও বোঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রঙের (কম্পনাঙ্কর) আলোক কণাগুলির শক্তি বিভিন্ন। আইনস্টাইন তাই প্লাঙ্কের কল্পনা আরো বিস্তৃত করে প্রমাণ করলেন যে আলোর শুধু ঝলকে ঝলকে শোষণ বিকিরণ হয় তাই নয়, আলো-কে শক্তিকণারূপেই উৎপন্ন বলে ভাবতে হবে। তিনি বললেন ν কম্পনাঙ্কর

আলো hν মাপের শক্তিকণারূপে ধাতুকে আঘাত করলে ν-র পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয় যাতে শক্তিকণাটি ইলেকট্রনকে বন্ধনমুক্ত করতে পারে, তবেই ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে। এই hν মাপের শক্তি-মোড়ক বা কণাগুলির নাম দেওয়া হল ফোটন।

১৯০৫-এর এই কাজের জন্যই ভবিষ্যতে আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

যাই হোক, প্লাঙ্ক-এর সমীকরণ যে একটা অমোঘ সত্য প্রকাশ করছে নানা পরীক্ষা করে তার নিশ্চিত প্রমাণ হতে থাকল। কিন্তু যে কণাবাদের ভিত্তিতে এই সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত হল প্লাঙ্ক নিজেই শুধু সেই তত্ত্বের সাহায্যে পুরোপুরি সমীকরণটি গড়ে তোলার উপায় খুঁজে পেলেন না। কিছুটা অংশ হার্জ (Hertz)-এর বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টির নিয়ম মিলিয়ে ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গগতিতত্ত্বর সাহায্যে সমীকরণটি গড়ে তোলার পদ্ধতি দিলেন। এটা এক ধরনের গোঁজামিল। অথচ এই সমীকরণ পরীক্ষা থেকে পাওয়া সব গুণের এত সুন্দর বিবরণ দিচ্ছে যে এর একটা সম্পূর্ণ সংগত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত সকলে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কাজটা সহজ নয়, ইউরোপ আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ডিবাই (Debye), আইনস্টাইন এঁরাও কিছু পদ্ধতি দিলেন, কিন্তু তাঁরাও সম্পূর্ণ কণা-বাদের ভিত্তিতে প্লাঙ্কের সূত্র গড়ে তুলতে পারলেন না। সনাতন বিদ্যুৎগতিতত্ত্বের আংশিক সাহায্য নিতে হল।

বাইরে পরীক্ষা করে দেখা সব-কিছুর সঙ্গে প্লাঙ্কের সূত্র মিলে গেল। বিকিরণকে hν শক্তিসম্পন্ন কণা বলে ভাবতে হল, কিন্তু এমন কণারূপে থাকতে হলে ভেতরের কি নিয়মের জন্য বাইরে প্লাঙ্ক-সূত্রের মতো নিয়ম পাওয়া যাবে, অর্থাৎ কোয়াণ্টাম-রূপ বিকিরণের উৎস কি নিয়ম মেনে চলে তার সম্পূর্ণ সমাধান হল না। আলো কি নিয়মে তৈরি হচ্ছে? সেই প্রশ্ন অনেক ঘুরতে ঘুরতে এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে।

তখনকার অবিভক্ত বাংলার সুদূর ঢাকায় বসে ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে ত্রিশ বছর বয়স্ক এক অধ্যাপকও প্লাঙ্ক-সূত্র গঠন-পথের এই যুক্তিগত অসংগতি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন আর ভাবতে থাকেন। কিছুকাল অবিরত চিন্তা আর অঙ্ক কষে মেলাবার চেষ্টার ফলে একদিন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্লাঙ্ক-সূত্রের সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পেলেন। এই আবিষ্কার একটি ছোটো প্রবন্ধের আকারে লিখে তিনি বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন' (*Philosophical Magazine*)-এ পাঠালেন। সেখান থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। হয়তো বক্তব্য বিষয়টি তাঁদের উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল।

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালে আইনস্টাইন দু পাতা সেই প্রবন্ধের কপিসহ একটি চিঠি পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞাতনামা বোসের কাছ থেকে : "...আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন সনাতন বিদ্যুৎগতিতত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই আমি প্লাঙ্ক-সূত্র গড়ে তুলেছি।"

একটা সত্যি সূত্রের একটা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সেই তত্ত্ব আরো অনেক সত্য পাবার পথ খুলে দেয়। আইনস্টাইন প্রবন্ধটি পড়েই বুঝলেন এই পদ্ধতি সেই রকম স্তরের কাজ। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় নিজে অনুবাদ করে জার্মানীর বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'জাইট্‌শ্রিফ্‌ট্ ফ্যুর ফিসিক্' (*Zeitschrift für Physik*)-এ প্রকাশ করলেন এবং গবেষণা-পত্রটির শেষে মন্তব্য করলেন, "আমার মতে বোস-প্রবর্তিত পদ্ধতি একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নির্দেশ করছে। এই পদ্ধতি ব্যবহারে আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টামতত্ত্বও পাওয়া যাবে যা আমি অন্যত্র কষে বের করব।"

অর্থাৎ বসুর কাজটি শুধু একটা নতুন পদ্ধতি নয়, পদার্থবিজ্ঞানে একটা নতুন ধারণার সূত্রপাত করল। অথচ এই সময়ে ঢাকায় আলোচনা করার মতো

মানুষ দূরের কথা— বই-পত্র, বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রায় ছিলই না। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালি সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বজোড়া বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

এই হল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামের সঙ্গে যুক্ত প্রধান কাজের পটভূমি। তাঁর তত্ত্ব এর পর নানা বিজ্ঞানী নানা ভাবে ব্যবহার করে পদার্থ আর শক্তির নানা গুণের সন্ধান পাচ্ছে আর বাস্তব ক্ষেত্রে পরখ করে দেখছে।

আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞানে শিক্ষিত হতে গেলে বসুর কাজ সম্বন্ধে না জানলে এগনো যায় না। নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হবে এমন একটি প্রবন্ধের মূল ব্যাপারটা কি ? কি নতুন ধারণা এত সুদূরপ্রসারী ফল দিল ?

সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির শুরুতে দুটি বাক্যে সারাংশ লিখছেন যা এইভাবে অনুবাদ করা যায় :

"একটা আলোক কণার অবস্থান, ভরবেগ নির্ণয়কারী একটা নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানকে h^3 মাপের ছোটো ছোটো ঘরে ভাগ করা হল। বাইরে থেকে বোঝা বিকিরণের ভেতরের এই আলোক কণাগুলির কতভাবে এই ঘরগুলিতে থাকা সম্ভব সেই হিসেব থেকেই বিকিরণের তাপগতি-বিষয়ক যাবতীয় গুণাবলী পাওয়া যাবে।"

মূল প্রবন্ধর প্রথম অংশর কিছুটা অনুবাদ এইরকম :

'কৃষ্ণবস্তু'র বিকিরণের শক্তির বণ্টন বিষয়ে প্লাঙ্ক-এর সূত্র কোয়াণ্টামতত্ত্বর সূত্রপাত করেছে, গত ২০ বছরে যা পদার্থবিজ্ঞানের নানা বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হবার পর এ সূত্র গড়ে তোলার নানা পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। এ কথা সকলেই জানেন যে কোয়াণ্টামতত্ত্বর মূল ধারণার সঙ্গে সনাতন বিদ্যুৎগতিতত্ত্ব খাপ খায় না। কিন্তু সবগুলি পদ্ধতিতেই বিকিরণের শক্তির ঘনত্বর সঙ্গে স্পন্দকের গড়পড়তা শক্তির সম্বন্ধের হিসাব করতে গিয়ে সনাতন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই অসংগতিমুক্ত যুক্তিসংগত পদ্ধতি দেবার বার বার চেষ্টা হয়েছে।

আইনস্টাইন এই-সব পদ্ধতিগুলির যুক্তিগত ত্রুটি লক্ষ করে সনাতনতত্ত্বর ওপর নির্ভর না করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনিও হুবীন এবং বোরের (Bohr) তুটি তত্ত্বর সাহায্য নিয়েছেন যেগুলি সনাতনতত্ত্বর ওপর নির্ভর করে।

সব ক্ষেত্রেই প্রমাণগুলি যথেষ্ট যুক্তিসংগত ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। অপর পক্ষে আলোক কণার ধারণা এবং কোয়াণ্টামতত্ত্বর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যা (statistical mechanics) প্রয়োগই সনাতনতত্ত্ব নিরপেক্ষ ভাবে এই সূত্র প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। এই পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখছি—

আত্মবিশ্বাস, বক্তব্য প্রকাশের সারল্য আর গাণিতিক কল্পনার সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো। এর পরে h^3 মাপের ঘরগুলিতে সব রকম আলোক কোয়াণ্টামগুলি কতভাবে থাকতে পারে তার হিসেব থেকে বাইরে দেখা নিয়ম 'প্লাঙ্কের সূত্র' পেয়েছেন আলোক কণাকে শুধু গ্যাসের কণার মতো কল্পনা ক'রে, তরঙ্গ-গুণের সাহায্য না নিয়ে। ঘরগুলি কিন্তু সাধারণ ঘর নয়, বৈজ্ঞানিক-কল্পিত ঘর। সাধারণ ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিন দিকের অক্ষর-মাপ জানলে ঘরে একটা বিন্দুর অবস্থান জানা যায়, কিন্তু এই ঘরের অক্ষর সাহায্যে ছটি মাপ জানা যায়— তিনটি অবস্থানের আর তিনটি ভরবেগের। V আয়তনের একটা আবদ্ধ স্থানে বিভিন্ন কম্পনাঙ্ক-অনুযায়ী আলোক কোয়াণ্টামের মোট শক্তির হিসাব করেছেন শুধু প্লাঙ্ক-এর নিয়ম অনুযায়ী বিকিরণকে $h\nu$ মাপের শক্তিকণা, এই কল্পনার ওপর নির্ভর ক'রে। হিসেবের আর একটিমাত্র যুক্তিসংগত শর্ত হচ্ছে কণাগুলি সব একরকম। অর্থাৎ তুটো কণা পরস্পরের মধ্যে ঘর বদল করলে কোনো তফাত বোঝা যাবে না— সমগ্র সমাবেশের শক্তির কোনো রদবদল হবে না। কিন্তু এক ঘরে তুটি এসে জড়ো হয়ে অন্য ঘরটি ফাঁকা রাখলে একটা নতুন সমাবেশ হল বলে বোঝা যাবে। ধরা যাক সাধারণ তুটো ঘর আছে তাতে রাম, শ্যাম ও যতুকে থাকতে বলা হল। তারা আট রকম ভাবে থাকতে পারে, পরপৃষ্ঠায় ছক 'ক' দ্রষ্টব্য।

	1	2	3	4	5	6	7	8	
I নং ঘর	শূন্য	র	শ	য	র, শ	র, য	শ, য	র, শ, য	ক
II নং ঘর	শ, শ, য	শ, য	র, য	র, শ	য	শ	র	শূন্য	

র=রাম শ=শ্যাম য=যদু

কিন্তু সবাই যদি যমজ ভাইয়ের মতো দেখতে হয় আর আলাদা বলে চেনা না যায় তবে তো এদের একটাই নাম দিতে হবে। ধরা যাক সেই নামটি রাম। তবে নিম্নলিখিত চার রকম সমাবেশ দেখা যাবে :

	1	2	3	4
I নং ঘর	শূন্য	র	র, র	র, র, র
II নং ঘর	র, র, র	র, র	র	শূন্য

'ক' সমাবেশের ২, ৩, ৪-এ শুধু 'র' বসালে আর তিনটিকে আলাদা করে চেনা যাবে না। ৫, ৬, ৭-এর জন্যও একটি সমাবেশ হবে। 'ক'-এর নিয়ম-অনুযায়ী ম্যাক্সওয়েল-বোল্ট্‌জ্‌মান স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স পদ্ধতি দিয়েছিলেন। আর 'খ' নিয়মে বসু হিসেব করলেন। ফোটন কণা বা গ্যাস কণা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার কোনো কারণ নেই। কাজেই 'খ' পদ্ধতির হিসেবের মূল কথা— কে কোন্ ঘরে আছে সে খবরে প্রয়োজন নেই। শূন্য ঘর কটা, একজন বাস করে কটায়, দুজন বাস করে কটায় ইত্যাদি করে ঘরগুলির সংখ্যার হিসেব করতে হবে। এই ভাবে জানা যাবে বিকিরণের শক্তি-বণ্টনের অবস্থা। একটা আবদ্ধ আয়তন V-র মধ্যে ν_1, ν_2, ν_3 এরকম নানা কম্পনাঙ্কর আলোক-কোয়াণ্টাম আছে, তারা নানা ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। একটা বিশেষ কম্পনাঙ্কর কণাগুলি ঘরগুলিতে কত ভাবে থাকতে পারে? কটা ঘরে শূন্য কণা, কটা ঘরে একটা কণা, কটায় দুটো—

এইভাবে কত রকম সম্ভাবনা আছে তার হিসেব করলেই সেই বিশেষ কম্পনাঙ্কর সঙ্গে জড়িত শক্তি কত তা জানা যাবে। আলাদা করে চেনা যায় না এমন ফোটন কণাগুলি বিভিন্ন ν-এর সীমার মধ্যে কত সংখ্যায় থাকতে পারে সেই হিসাব করতে গিয়ে যে পদ্ধতি জন্ম নিল তারই নাম বোস স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স। ফোটন কণার স্বভাব ও গতিবিধির ভেতরের খবর বোঝা গেল আর তার ভিত্তিতে প্লাঙ্ক-সূত্রের সম্পূর্ণ যুক্তিগত ত্রুটিমুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এর চেয়ে বেশি বুঝতে হলে— অনেক রকম অঙ্ক চর্চা করতে হবে আর বসুর মূল গবেষণা-পত্র পড়তে হবে। যাঁরা এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন তাঁরাই পুরোপুরি বসুর কাজ বুঝতে পারেন।

h^3 মাপের কুঠরি এই হিসেবের তাগিদেই কল্পনা করতে হল কণাগুলোর বিচরণ ক্ষেত্রে। পরে হাইজেনবার্গ (Heisenberg) কোয়াণ্টামতত্ত্ব গড়ে তুলতে যে বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তাবাদ' প্রবর্তন করেছিলেন যাতে বলা হয়েছে যে কোনো বস্তুকণার অবস্থান ও ভরবেগের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের গুণফলের পরিমাণের নিম্নতম সীমা h হবে, বসুর এই কল্পনায় তার ইঙ্গিত আছে— আর এর তাৎপর্য হাইজেনবার্গতত্ত্ব দিয়ে আরো পরিষ্কার হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কাজের ভিত্তিতে ক্রমশ নানা বিজ্ঞানী নানা ধরনের কাজ শুরু করে দিলেন। আইনস্টাইন আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে বোস-স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স প্রয়োগ করে একটি গবেষণা-পত্র পেশ করে গ্যাসের কোয়াণ্টামতত্ত্বর সূত্রপাত করলেন। তাই অনেকে এই তত্ত্বকে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স বলেন। আইনস্টাইন যখন বসুর তত্ত্বর প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা করছিলেন তখন বিজ্ঞানী লাঁজ্‌বা (Langevin) তাঁকে জানালেন যে লুই দ্য ব্রগলী (Louis de Broglie) নামে এক তরুণ ফরাসী বিজ্ঞানী বস্তুর কণার মধ্যে তরঙ্গধর্মের এক তাত্ত্বিক প্রমাণ পেয়েছেন। বসুর ধারণার সঙ্গে দ্য ব্রগলীর ধারণা মিলিয়ে আইনস্টাইন আর-একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করলেন। সেই কাজ থেকে শ্রয়েডিঙ্গার (Schroe-

dinger) অনুপ্রাণিত হয়ে তরঙ্গ-বলবিদ্যার বিখ্যাত সমীকরণ গড়ে তুললেন, যে সমীকরণ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। ফেরমি ইলেকট্রন জাতীয় কণার জন্য বিশেষ শর্ত আরোপ করে গড়ে তুললেন ফেরমি-ডিরাক স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স। যে-সব কণাগুলি বসুর নিয়ম মেনে চলে ডিরাক তাদের নাম দিলেন 'বোসন' আর যে-সব কণা ফেরমির নিয়ম মেনে চলে তাদের নাম দিলেন 'ফেরমিয়ন'। বিকিরণ আর বস্তুকণার কণা-স্বভাব আর তরঙ্গ-স্বভাব নতুন কোয়াণ্টামবাদের ভিত্তিতে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো হল শ্রয়েডিঙ্গার, ডিরাক, বর্ন (Born), হাইজেন-বার্গ ইত্যাদি বিজ্ঞানীর মিলিত চেষ্টায় অপূর্ব কাজের ফলে। এখনো এই তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রকে আরো ত্রুটিবর্জিত রূপ দিয়েছে এই তত্ত্ব।

৪

আজকের দিনে পদার্থর ভেতরের নিয়ম-কানুনের খবর পাবার একটা প্রধান পথ হল মৌল কণার প্রকৃতি অনুসন্ধান। এই সন্ধানের পথে বোস স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স -এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপানে নানা বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে চলেছে। বিশেষ করে খুব নিচু তাপমাত্রায় হিলিয়মের নানা আশ্চর্য ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিয়ম-অনুসারেই সম্ভব হয়েছে। এই-সব কাজের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

পদার্থের নানা গুণের পরীক্ষা করতে করতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে বাধ্য হলেন যে পরমাণুর ভেতর তিন রকমের কণা আছে। ১. + বিদ্যুৎযুক্ত ; ২. − বিদ্যুৎ-যুক্ত ; ৩. বিদ্যুৎশূন্য। এই কণারা কি ধরনের শক্তি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা আছে তা বুঝতে গিয়ে আরো অনেক মৌল কণার সন্ধান পাওয়া গেল।

প্লাঙ্ক-সমীকরণের সংগত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বসু দুটি ধারণার ওপর নির্ভর করেছিলেন :

১. ফোটন বা আলোক কণাগুলিকে আলাদা করে চেনা যাবে না। অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন;

২. যে-কোনো একটি কোয়ান্টাম স্তরের শক্তির অবস্থায় যে-কোনো সংখ্যক কণা থাকতে পারে।

ফোটন, যাদের ভর শূন্য, তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করার জন্যই এই নিয়মগুলি কল্পনা করা হয়েছিল।

যাদের ভর আছে, অর্থাৎ বস্তুকণার ক্ষেত্রে বসুর নিয়ম প্রয়োগ করতে গিয়ে আইনস্টাইন তাত্ত্বিক বিচার করে দেখালেন যে কোনো বস্তুকে ঠাণ্ডা করতে করতে চরম শূন্য (absolute zero)[১] তাপমাত্রায় পৌঁছলে বস্তুকণাগুলি যদি বসুর নিয়ম মেনে চলে তবে সব কণাগুলি সব চেয়ে নিচু ধাপের শক্তির অবস্থায় পৌঁছবে। ফলে বস্তুর নানা অচেনা ব্যবহার দেখা যাবে। অনেক-সংখ্যক গ্যাস কণা এই অবস্থায় পৌঁছলে শক্তিস্তরে যে ঘন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তাকে বলা হল Bose Condensation বা 'বোস ঘনীভবন'। ভবিষ্যতে হিলিয়ম গ্যাসকে খুব কম তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে সত্যিই নানা রকম নতুন ব্যবহার দেখা গেল।

কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি কণার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে এই-সব কণা পাউলি (Pauli)-র নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়ম-অনুযায়ী দুটি কণা এক-সঙ্গে এক শক্তির অবস্থায় থাকতে পারে না। তাই ১৯২৬-এ ফেরমি ও ডিরাক ভেবে দেখলেন যে অভিন্ন কণার এই নতুন স্ট্যাটিস্টিক্‌সকে পাউলির শর্ত মেনে চলা রূপ দিতে গেলে কণাদের আচরণের কিছু তফাত হবার কথা। ফেরমি ও ডিরাক এই ধরনের কণার উপযুক্ত স্ট্যাটিস্টিক্‌স গড়ে তুললেন। এই নিয়ম মেনে চলা কণারা চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে পৌঁছলেও তাদের যথেষ্ট শক্তি থাকে। কারণ

১ — 273°C (সেন্টিগ্রেড) বা OK (কেলভিন)-কে চরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়। এর চেয়ে নিচু তাপমাত্রা কল্পনা করা যায় না। কারণ যে-কোনো গ্যাসের আয়তন এই তাপমাত্রায় শূন্য হয়ে যাবার কথা।

সব কণা একসঙ্গে সব চেয়ে কম শক্তিস্তরে পৌঁছতে পারে না। পরীক্ষা করে ফেরমি-কণাদের এই গুণও ধরা পড়েছে।

১৯২৬ সালে ডিরাক একটা অঙ্কের সূত্র তৈরি করলেন যা 'বোসন' ও 'ফের-মিয়ন' এই দু ধরনের অভিন্ন কণাগুলি ভেতরের কি নিয়মের জন্য দু রকম ব্যবহার করে তার তত্ত্বগত বর্ণনা দিল। বাইরে থেকে দেখা সব ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিন্নতা গুণ বজায় রেখে কণাদের অবস্থার বর্ণনা করে যে অঙ্কের সম্পর্ক তৈরি হল তাতে দুটি কণা পরস্পরের মধ্যে দুভাবে জায়গা বদল করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে অঙ্কের সম্পর্কটিকে $+1$ দিয়ে গুণ করলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে -1 দিয়ে গুণ করলে পরিবর্তিত অবস্থা পাওয়া যাবে। প্রথমটিকে সমতাধর্মী (symmetric) এবং দ্বিতীয়টিকে বিপরীত সমতাধর্মী (anti-symmetric) সমাধান বলা হল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুটি কণা এক অবস্থায় জড়ো হতে গেলে তাদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া অঙ্কের রাশির যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ তেমন অবস্থা প্রকৃতিতে সম্ভব হবে না। এটাই 'পাউলির সূত্র' (Pauli Principle) এবং এই কণারা 'ফেরমিয়ন'। প্রথম সমাধানের ক্ষেত্রে অঙ্কের রাশিটি লুপ্ত হয় না, তাই এক অবস্থায় অনেক কণা জড়ো হতে পারে। এমন কণারা 'বোসন'।

অনেক দিন ধরে গড়ে-ওঠা গণিতের চর্চা ও গভীর কল্পনাশক্তির সাহায্যে ডিরাক পদার্থের দুই মূলগত নিয়মকে একসূত্রে বাঁধলেন। তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে আবার বিশেষ পরিশ্রম করে বিশেষ অঙ্ক আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু আমাদের চেনাশোনা অঙ্ক $+x$ বা $-x$ কে বর্গ করে x^2 পাওয়া অথবা সম্পূর্ণ একরকম গোলক দিয়ে তৈরি একটা ডাম্ব-বেলের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার দিকে বা তার উল্টোদিকে 180° ঘুরিয়ে দিলে যে অপরিবর্তিত অবস্থা পাওয়া যায় তা থেকে দুই বিভিন্ন ভাবে অভিন্ন ফল পাবার উদাহরণ দেখা যায়।

কণার নানা গুণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কণার 'স্পিন' বা লাট্টুর মতো নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘোরার মতো একটা গুণের কল্পনা করতে হল। ১৯৪০ সালে পাউলি এই 'স্পিন' গুণটির সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ভিত্তিতে কণার শ্রেণীবিভাগ

করার একটা সম্পর্ক খুঁজে পেলেন। 'স্পিন' $\frac{h}{2\pi}$[২] মাপের এককের সাহায্যে মাপা হয়। দেখা গেল যে-সব কণা বোস-স্ট্যাটিস্টিক্স মানে তাদের 'স্পিন'-এর মাপ 0, 1, 2, 3 ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা হয় আর যে কণারা ফেরমি-স্ট্যাটিস্টিক্স মানে তাদের 'স্পিন'-এর মাপ হয় $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$ ইত্যাদি অর্ধ পূর্ণসংখ্যা। অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্স-এর নিয়ম 'একটি' মৌল কণার নিজস্ব স্বভাবের ভেতরেই আছে, অনেক কণা সমাবেশের নয়।

'বোসন' কণার কেমন গুণ হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে ১৯২৫-২৬ সালে আইনস্টাইন ও ডিরাক তাত্ত্বিক আলোচনা করলেন। কিন্তু প্রকৃতিতে তখনো ভরশূন্য আলোক কণা ছাড়া ভরযুক্ত কোনো বস্তুকণা পাওয়া যায় নি যাকে 'বোসন' শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তাই এ বিষয়ে কিছুদিন আর কোনো কাজ হল না। ১৯৩৫ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া (Yukawa) হিসেব কষে দেখালেন যে পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসের ভেতরে এমন কোনো কণা থাকা উচিত যার ভর ইলেকট্রনের 200 গুণ বেশি আর যার 'স্পিন'-এর মাপ পূর্ণসংখ্যা। অর্থাৎ সেই কণা 'বোসন'। যদিও তেমন কণার খবর পরীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু এইরকম কণা না থাকলে নিউক্লিয়াসের ভেতরের কণাগুলির মধ্যে স্বল্প দূরত্বর প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কল্পিত কণার তিনি নাম দিলেন ভারী কোয়াণ্টাম (heavy quantum)। পরে মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে এই রকম কণার খবর পাওয়া গেল যার নাম দেওয়া হল 'পাইয়ন' (Pion)। বিজ্ঞানীদের খোঁজার পথে একে একে নানা রকম কণার সন্ধান পাওয়া গেল যারা খুব কম সময়ের জন্য হঠাৎ দেখা দিয়ে তার পর অন্য কণা বা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কণারা কেউ বিদ্যুৎশূন্য, কেউ বিদ্যুৎযুক্ত। কারো 'স্পিন'-এর মাপ পূর্ণসংখ্যক কারো-বা অর্ধ পূর্ণসংখ্যক।

২ h প্লাঙ্কের ধ্রুবক। যে-কোনো বৃত্তের পরিধির মাপকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে $\frac{22}{7}$ এই ধ্রুব-সংখ্যাটি পাওয়া যায় যাকে গ্রীক অক্ষর π (পাই) নামে বোঝানো হয়।

অর্থাৎ কিছু কণা 'বোসন' কিছু 'ফেরমিয়ন'।

'বোসন'-এর বিশেষ গুণের প্রভাবে তরল হিলিয়মে যে-সব আশ্চর্য গুণ ধরা পড়ল তা নিয়ে নানা পরীক্ষা আর তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

একটা ডেওয়ার ফ্লাস্কে রাখা তরল-বায়ুর ভেতরে আর-একটি ডেওয়ার পাত্রে নতুন তৈরি তরল হিলিয়ম রাখা হল। হিলিয়ম 4·2 K তাপমাত্রায় তরল হয়। তাপ বিকিরণ কমাবার জন্য পাত্র দুটিতে যে রূপোর আস্তরণ লাগানো থাকে তার মাঝে একটা ছোটো জায়গা পরিষ্কার করে রাখা হল যাতে ভেতরটা দেখা যায়। দুটি তরলকেই ফুটতে দেখা যাবে। তরল-বায়ুর পাত্রের মুখ খোলা থাকবে যাতে তার উপরের চাপ বাইরের বায়ুর চাপের সমান হয়। ভেতরের পাত্র থেকে বায়ু টেনে নেবার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে তরল হিলিয়ম ক্রমশ বেশি ঠাণ্ডা হতে থাকবে। এই ভাবে 2·19 K-তে দেখা যাবে যে হঠাৎ হিলিয়মের ফোটা বন্ধ হয়ে ওপরটা কাচের মতো মসৃণ হয়ে গেছে। বায়ু টেনে নিতে থাকলে তরলটি আরো ঠাণ্ডা হবে কিন্তু ওপরের তলের নড়াচড়া হবে না। এই তাপমাত্রার কাছে তাপ কমার সঙ্গে তরলটির একটা বিশেষ গুণের পরিবর্তনের লেখচিত্রর গ্রীক অক্ষর λ (ল্যামডা)-র সঙ্গে মিল দেখে বিজ্ঞানীরা এই তাপমাত্রার নাম দিয়েছেন ল্যামডা পয়েণ্ট (λ-point)। হিলিয়মের এই নতুন অবস্থার নাম দেওয়া হল He(II) বা হিলিয়ম(II)।

নানা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পদার্থের কঠিন, তরল বা বায়বীয় এই তিন পরিচিত রূপের কোনোটির সঙ্গেই হিলিয়মের এই নতুন অবস্থার মিল নেই। সব তরলেরই চলার পথে ওপর থেকে নীচে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কম-বেশি কিছুটা পিছুটান থাকে যাকে বলা হয় viscosity বা সান্দ্রতা। বেশি সচল জলের চেয়ে তরল গুড়ের এই চলা রোধ করার গুণটি বেশি। হিলিয়ম(II)-তে এই গুণটি একেবারেই দেখা যায় না। খুব সরু নলের মধ্যে দিয়ে বিনা রোধে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। বয়ে যাবার গতি যত বেশি হয় সান্দ্রতা তত কম হয়। সান্দ্রতা মাপার

আর-একটা উপায় আছে। একটা বড়ো ব্যাসের নলের মাঝখানে একটা ছোটো ব্যাসের নল রেখে মাঝের বলয়ের মতো ফাঁকে তরলটি ভরে বাইরের নলটিকে আস্তে আস্তে ঘোরানো হয়। সান্দ্রতার দরুন তরলের ভিতর দিয়ে বাইরে থেকে ভেতরের নলে বল সঞ্চারিত হয়ে তাকে বাইরের নলের মতো করে ঘোরাতে চেষ্টা করবে (চিত্র ৩)। এই বলের পরিমাণ থেকে তরলটির সান্দ্রতা মাপা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই ভাবে মাপলে দেখা যায় হিলিয়ম (II)-এর সান্দ্রতা যথেষ্ট বেশি।

(চিত্র ৩)

সাধারণ গ্যাসের চেয়ে হিলিয়ম (II) আরো সচল কিন্তু তরলের মতো অভিকর্ষ (gravity)-র বশে পাত্রের তলায় জড়ো হয়। তরলের মতো একটা উপরের তলও থাকে। 4·2 K-তে তরল হয়ে 2·19 K-তে যখন একটা অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই মনে হবে যে তরলটি কঠিন অবস্থায় পৌঁচেছে। কিন্তু কঠিন পদার্থ এত সচল হয় না। তা ছাড়া বায়ুর চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে 25 গুণ বাড়িয়ে দিলে সাধারণ কঠিন পদার্থের মতো কঠিন হিলিয়ম তৈরি করা যায়।
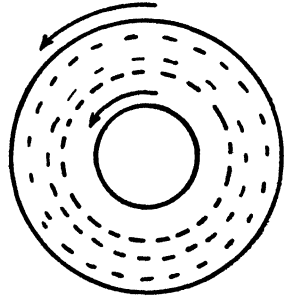
পদার্থের পরিচিত তিন রূপের বাইরে এই চতুর্থ রূপকে বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন 'কোয়াণ্টাম ফ্লুইড' (Quantum fluid)। কারণ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব থেকেই এই অচেনা স্বভাব ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণ হিলিয়ম গ্যাসের পরমাণুর ভর 4 এবং তারা 'বোসন'। এই পরমাণুরাই ল্যামডা পয়েণ্টের নীচে হিলিয়ম (II) হয়ে যায়। তাই এই পরিবর্তিত তরলকে Bose Liquid বা 'বোস-তরল'ও বলা হয়।

হিলিয়ম (II)-এর আরো কিছু আশ্চর্য ব্যবহার দেখা যায়।

১. যদি একটা ছোটো খালি পাত্রের তলার অংশ আর-একটা বড়ো পাত্রে রাখা হিলিয়ম (II)-তে ডোবানো হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে খালি পাত্রের

বাইরের গা বেয়ে হিলিয়ম (II) ছোটো পাত্রে ঢুকেছে আর বাইরের ও ভেতরের পাত্রের হিলিয়মের উপরের তল এক স্তরে এসেছে। ছোটো পাত্রটি তুলে নিলে আবার তরলটি পাত্রের ভেতরের দেয়াল বেয়ে উঠে বাইরে পড়ে যায়। জল বা অন্য কোনো তরল এমন নিজে নিজে ওঠে না। নল দিয়ে টেনে তুলতে হয় (চিত্র ৪ ক)।
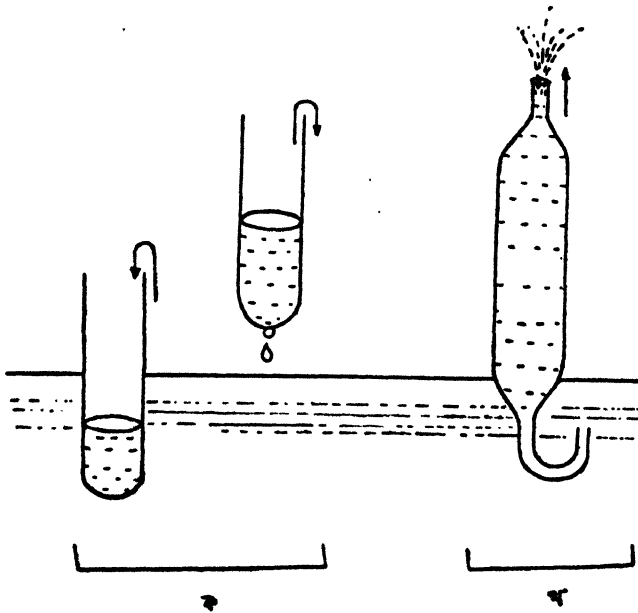
(চিত্র ৪)

২. নীচে খুব সরু নলের মুখ ও ওপরেও কিছুটা সরু মুখের একটা পাত্র হিলিয়ম (II)-তে ডোবালে দেখা যাবে নীচের সরু নল বেয়ে তরলটি স্বচ্ছন্দে পাত্রে ঢুকে যাবে। এবার পাত্রের উপরের দিকটা আলো ফেলে গরম করলে তরলটি ফোয়ারার মতো উপরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে (চিত্র ৪ খ)।

৩. হিলিয়ম (II) খুব দ্রুতবেগে তাপ পরিবহন করে। রুশ-গবেষকরা বাতাসে শব্দ-তরঙ্গ চলার সঙ্গে এই ঘটনার মিল দেখে এর নাম দিয়েছেন দ্বিতীয় শব্দ (second sound)।

৪. বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী লান্দাউ (Landau) তাত্ত্বিক বিচার করে হিলিয়ম (II)-এর একটা বিশেষ ব্যবহার দেখা যাবার সম্ভাবনার কথা বললেন। ১৯৪৬ সালে আন্দ্রোনিকাশভিলি (Andronikashvilli) তা পরীক্ষা করে দেখালেন।

খুব সূক্ষ্ম ব্যবধানে রাখা কয়েকটি গোল চাকতিগুচ্ছের কেন্দ্রর ভেতর দিয়ে একটা তন্তু ঢুকিয়ে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হল যাতে চাকতিগুচ্ছ ঘড়ির ভেতরের ব্যালান্স-চাকার মতো তালে তালে আধ চক্কর ঘড়ির কাঁটার দিকে, আধ চক্কর তার উল্টো দিকে ঘুরতে পারে। চাকতিগুচ্ছ হিলিয়ম (II)-তে ডুবিয়ে দিলে দেখা যায় যে ল্যামডা পয়েন্টের নীচে তাপমাত্রা পৌঁছলেই ঘোরার তাল বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এক চক্কর ঘুরতে সময় কম লাগছে। এই সময়টা চাকতির ভরের ওপর নির্ভর করে। ভর কম হলে গতি বাড়বে। তরলে ডোবানো চাকতিগুচ্ছের ভর ল্যামডা পয়েন্টের নীচে নিশ্চয়ই কোনো কারণে কমে যাচ্ছে।

এই-সব আশ্চর্য ঘটনার কারণ কি? বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে চরম শূন্য তাপ-মাত্রার কিছু আগেই কিছু-সংখ্যক পরমাণু সব চেয়ে নিচু ধাপের শক্তির অবস্থায় পৌঁছয়। কোয়াণ্টামতত্ত্বের ধারণার সাহায্যে এই অবস্থার বর্ণনা করা যায়। কোয়াণ্টামতত্ত্বে বলা হয় যে পরমাণুর শক্তি তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে অনবরত না বদলিয়ে ধাপে ধাপে বদলায়। তাপমাত্রা কমার সঙ্গে শক্তি কমে যাবার লেখচিত্র তাই ধাপে ধাপে আঁকতে হবে— একটানা রেখায় নয়। সাধারণ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ শক্তির তুলনায় ধাপগুলি এত ছোটো যে প্রায় একটানা রেখার মতোই দেখাবে। দু-একটা পরমাণুর শক্তির দু-এক ধাপ ওঠা-পড়ায় সে রেখার ওঠা-নামা বোঝা যাবে না। অর্থাৎ অনেক পরমাণুর এলোমেলো নড়াচড়ার আড়ালে ছোটো একটা পরমাণুর আলাদা কোয়াণ্টাম স্বভাব ঢাকা পড়ে যাবে।

চরম শূন্যের কাছে কিন্তু বেশির ভাগ পরমাণুর শক্তি সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছাকাছি পৌছবে। তখন কিন্তু কোয়াণ্টাম ধাপগুলির মাপ সম্পূর্ণ শক্তির তুলনায় অগ্রাহ্য করার মতো নয়। ঠিক শেষ ধাপের আগে যে-সব পরমাণু থাকবে তারা একটি 'কোয়াণ্টাম' বা 'ফোটন' বিকিরণ করে নেমে যাবে সব চেয়ে নিচু ধাপে। সাধারণ তাপমাত্রায় মাঝামাঝি শক্তির পরমাণু সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকে। চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে সে নিয়ম আর থাকছে না। সব চেয়ে নিচু ধাপের পরমাণুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে আর তরলের স্বভাব কেমন হবে তা এই পরমাণুদের অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। সমস্ত তরলটির শক্তি এক কোয়াণ্টামের সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছে। তাই চোখে দেখার মতো বিস্তৃত বড়ো মাপের হওয়া সত্ত্বেও তরলটির পরমাণুর মাপের কণার মতো কোয়াণ্টাম স্বভাব ফুটে উঠছে। হিলিয়ম (II) হচ্ছে হিলিয়মের তেমন একটি অবস্থা। বিজ্ঞানী লণ্ডন (London) এই অবস্থাকে 'বোস-ঘনীভবন' বলে বুঝতে পারেন। হিলিয়ম (II) পরমাণুরা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। এরাই হিলিয়ম (II)-এর নানা গুণের জন্য দায়ী। হিলিয়মকে যত ঠাণ্ডা করা যাবে তত বেশি-সংখ্যক পরমাণু সব চেয়ে নিচু ধাপের শক্তিস্তরে গিয়ে হিলিয়ম (II) হয়ে যাবে। একই তরলের মধ্যে একসঙ্গে এমন দুরকম তরল আছে এই কল্পনার সাহায্যে হিলিয়ম (II) -এর সব আশ্চর্য গুণের কারণ পাওয়া যায়।

পদার্থবিদের কাছে কোনো ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করার মানে হল পদার্থ যে-সব মৌল কণা দিয়ে তৈরি তাদের গতিবিধির ভিত্তিতে বড়ো মাপের পদার্থের আচরণের কারণ খুঁজে দেখা। দূরে দূরে ছড়িয়ে-থাকা অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি লঘু বায়বীয় পদার্থের তাপ, চাপ, আয়তন ইত্যাদির সম্পর্কের নিয়মগুলি এইভাবে অণু-পরমাণুর চালচলনের ভিত্তিকে বেশ ভালো ভাবেই হিসেব করে বোঝা গেছে। তরলের ক্ষেত্রে কিন্তু কণাগুলি খুব কাছাকাছি থাকার দরুন একটি কণার গতিবিধির ওপর তার আশপাশের কণার প্রভাবের হিসেব করা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। হিলিয়ম (II) পরমাণুর ভর খুব কম। তাই

পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের বল খুব কম হবে বলে মনে হতে পারে যে এই তরলের গতিবিধির ক্ষেত্রে হয়তো গ্যাসের মতো সহজ হিসেব কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু বোঝা গেল যে হিলিয়ম পরমাণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা সম্ভবই নয়। সমস্ত তরলটিকে একসঙ্গে নিয়ে হিসেব পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। কোয়াণ্টাম নিয়ম -অনুযায়ী এই কোয়াণ্টাম তরলের প্রত্যেকটি পরমাণুকে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন ভাবতে হবে। অর্থাৎ অঙ্কের ভাষায় তরলটির বিবরণ দেবার জন্য যে-সব সূত্র তৈরি করতে হবে, পরমাণুরা স্থান পরিবর্তন করলে তার কোনো পরিবর্তন হবে না। তার মানে সমস্ত তরলটির কোনো জায়গার কোনো পরমাণুর গতিবিধি অন্য-কোনো জায়গা থেকে আলাদা করা যাবে না। তাই এক-একটা বিচ্ছিন্ন পরমাণুর শক্তি আলাদা করে হিসেব না করে সমস্ত তরলটি একটানা অবিচ্ছিন্ন ভাবে সব চেয়ে নিচু শক্তিস্তরে আছে বলে ভাবতে হবে। কোয়াণ্টামতত্ত্ব-অনুযায়ী এই স্তরেও কিছুটা শক্তি থাকে যাকে Zero-point energy বা 'শূন্যবিন্দুর শক্তি' বলা হয়। এই শক্তির জন্যই পরমাণুগুলি সম্পূর্ণ স্থির হয়ে কঠিন অবস্থায় না পৌঁছে তরল থাকছে। কিন্তু তরলের স্তর থেকে স্তরে ভরবেগ ছড়িয়ে দিয়ে সান্দ্রতা সৃষ্টি করার পক্ষে এই শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। গ্যাসের মতো ছড়িয়ে পড়ার উপযুক্ত শক্তিও নেই। পরমাণুর ভর খুব কম[৩] হবার দরুন পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ কম বলেও কঠিন হতে পারছে না। হিসেব করে বিজ্ঞানীরা কোয়াণ্টাম নিয়ম-অনুযায়ী 'শূন্যবিন্দুর শক্তি' থাকার কথা ভেবেছিলেন। হিলিয়ম (II)-এর ব্যবহার থেকে এই শক্তি যে আছে তার একটা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।

তাপমাত্রা একটু বাড়ালে তরলটি একটু উঁচু কোয়াণ্টাম ধাপের শক্তিস্তরে বা উত্তেজিত অবস্থায় পৌঁছবে। ফলে কিছু আন্দোলন হবে তরলটিতে। কিন্তু শূন্যের খুব কাছাকাছি তাপমাত্রায় তরলটি খুব বেশি-সংখ্যক শক্তির ধাপে বেশি মাত্রায় পৌঁছবে না। সব চেয়ে নিচু ধাপের প্রাথমিক শক্তির সঙ্গে কয়েকটি উত্তেজিত

---

৩ হিলিয়ম পরমাণুর ভর হাইড্রোজেনের ভরের চার গুণ। হাইড্রোজেন ছাড়া সব মৌলিক পদার্থর মধ্যে হিলিয়মের ভর সব চেয়ে কম।

শক্তিস্তরে থাকলে তরলটিতে যে-সব সূক্ষ্ম আন্দোলন হবে লান্দাউ তাকে শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করলেন। এই তরঙ্গগুলি শব্দ-তরঙ্গর মতো শক্তি ও ভরবেগ বহন করবে। সমস্ত তরলটির শক্তি প্রাথমিক স্তর ও এই-সব স্তরের শক্তির যোগফল হবে। উদারার ষড়জে বাঁধা তানপুরার তারকে কাঁপিয়ে দিলে যেমন প্রাথমিক (fundamental) বড়ো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর ষড়জ স্বরের সঙ্গে পঞ্চম গান্ধার এই-সব ছোটো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর স্বর (overtones) সৃষ্টি হয়।

যদি তরলের সব চেয়ে নিচু ধাপের শক্তি ও ভরবেগকে যথাক্রমে E_0 ও P_0 বলা হয় তবে সম্পূর্ণ শক্তি E হবে :

$$E = E_0 + n_1e_1 + n_2e_2 + n_3e_3 + \cdots \text{ ইত্যাদি।}$$

e_1, e_2 ইত্যাদি বিভিন্ন উত্তেজিত স্তরের শক্তি।

n_1, n_2 ইত্যাদি সেই শক্তির তরঙ্গের সংখ্যা।

ভরবেগের জন্য এইরকম সমীকরণ হবে :

$$P = P_0 + p_1n_1 + p_2n_2 + \cdots$$

লান্দাউ এই অবস্থার বিবরণ দেবার জন্য চিন্তাকে আরো বিস্তার করলেন। তিনি বললেন তরলটিতে E_0 P_0 শক্তি ও ভরবেগের একটা প্রাথমিক পটভূমিতে যেন উত্তেজিত শক্তির কিছু কণা ডুবে আছে। তানপুরার একটানা বিস্তৃত স্বরের ভিত্তির ওপর যেমন র গ ম প ধ ন ইত্যাদি স্বরের দানাগুলি কম-বেশি মাত্রায় বাজানো যায়।

হিলিয়ম (II)-এর উত্তেজিত অবস্থার কম্পনগুলিকে কণারূপে কল্পনা করা হচ্ছে হিসেবের সুবিধার জন্য কিন্তু আসলে এরা সত্যি কণা নয়। তাই এদের 'quasi-particle' নাম দেওয়া হয়েছে। এদের 'কণা-প্রতিম' বলা যাক। সাধারণ তরলে সত্যি কণাগুলি কাছাকাছি জড়ো হয়ে থাকার জন্য তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের হিসেব কঠিন। কিন্তু হিলিয়ম (II)-কে এইভাবে কল্পনা করলে অল্প-কয়েকটি 'কণা-প্রতিম'-এর হালকা গ্যাসের মতো হিসেব করা যাবে।

সমস্ত তরলটির বিভিন্ন কম্পনের ধরন (mode)-কে 'কণা-প্রতিম' নাম দেওয়া

হল। এরা মোটামুটি সাধারণ গ্যাস কণার মতো ব্যবহার করলেও দুটি প্রধান তফাত আছে। একটা পাত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস নিলে তার কণার সংখ্যা একই থাকে। কিন্তু তরল হিলিয়ম (II)-তে 'কণা-প্রতিম'দের সংখ্যা তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। চরম শূন্য তাপমাত্রায় একটিও থাকে না— তাপমাত্রা বাড়ালে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথমে লান্দাউ পরে ফাইনমান (Feynmann) -এর চেষ্টায় সাধারণ কণা আর 'কণা-প্রতিম'দের শক্তি ও ভরবেগের সম্পর্কের লেখচিত্র কেমন হবে তা তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বোঝা গেছে। সাধারণ কণার শক্তি ও ভরবেগের অনুপাতের শূন্য থেকে শুরু করে যে-কোনো মান হতে পারে। কিন্তু 'কণা-প্রতিম'দের ক্ষেত্রে এই অনুপাত একটা নিম্নতম সীমার নীচে যাওয়া সম্ভব নয়। এই গুণ থেকে অতিসচলতার কারণ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

ধরা যাক, চরম শূন্য তাপমাত্রার তরল হিলিয়মে একটা গুলিকে একটা গতিবেগে চলতে দেওয়া হল। এ অবস্থায় তরলে একটিও 'কণা-প্রতিম' নেই। সাধারণ তরল হলে তরলের বিভিন্ন কণার সঙ্গে ধাক্কা লেগে শক্তি ভাগ করে দিতে দিতে গুলিটির গতি ক্রমশ কমে যেত। চরম শূন্য থেকে এক ধাপ ওপরে ওঠার শক্তি পেলেই প্রাথমিক তরলে একটি 'কণা-প্রতিম' তৈরি হবে। যদি এই 'কণা-প্রতিম'কে নিজের শক্তির ভাগ দিতে পারে তবেই গুলিটির গতিবেগ কমবে। কণাদের মধ্যে ভরবেগ আদান-প্রদান হলে সম্পূর্ণ ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে। তাই গুলিটি থেকে 'কণা-প্রতিম' যে অনুপাতে ভরবেগ নেবে তা গুলিটির গতির ওপর নির্ভর করবে। যদি এই গতি যথেষ্ট কম হয় যাতে 'কণা-প্রতিম'-এর নেবার মতো সব চেয়ে কম মাপের চেয়েও শক্তি ও ভরবেগের অনুপাত কম হয়ে যায় তবে গুলিটি তরলটিকে শক্তি দিতে পারবে না। তাই একই গতিতে চলতে থাকবে। তরল খুব ধীর গতিতে চলতে থাকলেও একই কারণে পাত্রের দেয়ালকে শক্তির ভাগ দিতে পারবে না। তাই দেয়াল বেয়ে বিনা রোধে চলতে থাকবে অর্থাৎ অতিসচল হবে।

সব চেয়ে নিচু স্তরের তরলের তাই সান্দ্রতা থাকবে না, তাপ থাকবে না আর অতিসচল হবে। কিন্তু উত্তেজিত স্তরে অর্থাৎ 'কণা-প্রতিম'দের সাধারণ তরলের

মতো সান্দ্রতা, তাপ, এই-সব সাধারণ গুণগুলি থাকবে আর অতিসচল হবে না। আসলে তাপ যোগ করলেই তরলের কিছু অংশ এই অবস্থায় পৌঁছবে। সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়া তরলের ওপর পরীক্ষা করলে যে সান্দ্রতা একেবারেই দেখা যায় না তার কারণ হল বয়ে যাচ্ছে অতিসচল তরল। কিন্তু দুটো এককেন্দ্রিক ছোটো-বড়ো মুখের নলের মাঝের বলয়ে তরল রেখে বাইরের নল ঘোরালে 'কণা-প্রতিম'রা বাইরে থেকে ভেতরে বল নিয়ে গিয়ে সান্দ্রতার সৃষ্টি করছে। তরলের অতিসচল অংশ এ কাজে যোগ দিচ্ছে না। কাজেই দু ক্ষেত্রে অতিসচল এবং সাধারণ এই দু ধরনের তরলের সান্দ্রতা মাপা হচ্ছে। তাই বিভিন্ন ফল দেখা যাচ্ছে।

দুই প্রকৃতির তরল বা একটি তরলে 'কণা-প্রতিম'রা ডুবে আছে এই কল্পনার সাহায্যে তরল হিলিয়মের অন্যান্য আশ্চর্য ব্যবহারও বোঝা যায়।

সূক্ষ্ম ব্যবধানে রাখা চাকতিগুচ্ছ যখন খুব ঠাণ্ডা তরল হিলিয়মে রেখে ঘোরানো হয় তখন ল্যামডা পয়েণ্টের কাছে অতিসচল তরল পিছলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু 'কণা-প্রতিম'রা দুটো চাকতির সূক্ষ্ম ফাঁকে আটকে গিয়ে চাকতির সঙ্গে ঘুরতে থাকে। ফলে চাকতিদের ওজন বেড়ে যায়। তরল যত ঠাণ্ডা হবে 'কণা-প্রতিম'দের সংখ্যা তত কমে গিয়ে চাকতির ওজন কমে যাবে আর ঘোরার তাল বেড়ে যাবে।

অতিসচল তরল সরু নল বেয়ে উঠে আলো থেকে তাপ নিয়ে 'কণা-প্রতিম' হয়ে ওপরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে সাধারণ তরল অবস্থার জন্য আর নল বেয়ে ফিরতে পারে না। ইতিমধ্যে আরো অতিসচল তরল উঠে এইভাবে বেরিয়ে এসে ফোয়ারা প্রবাহ তৈরি করে। নীচের পাত্রের তাপমাত্রা যতক্ষণ ল্যামডা পয়েণ্টের চেয়ে কম রাখা হবে এই প্রবাহ অবিরাম চলবে।

একটা সুন্দর পরীক্ষা থেকে একই তরলে এই দু ধরনের তরলের সহাবস্থানের একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটা দুদিক-খোলা নলের নীচের মুখ এমারি পাথরের খুব মিহি গুঁড়ো ঠেসে দিয়ে বন্ধ করে নলটিতে হিলিয়ম (II) রাখা হল। তরলের অতিসচল অংশ মিহি গুঁড়োর ভেতরের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে কিন্তু উঁচু শক্তিস্তরের 'কণা-

প্রতিম'রা বেরোতে পারবে না। কাজেই পাত্রে 'কণা-প্রতিম'দের ঘনত্ব বেড়ে যাবে। যেহেতু 'কণা-প্রতিম'দের সংখ্যার ওপর তাপমাত্রা নির্ভর করে পাত্রের তরলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া উচিত। মেপে দেখা যায় যে সত্যিই তাপমাত্রা বেড়ে গেছে।

এই-সব নানা পরীক্ষায় ক্রমশ সূক্ষ্ম মাপজোখের সাহায্যে ভেতরের খবরের ভিত্তিতে বাইরের ব্যবহার বোঝা যাচ্ছে আর বিজ্ঞানীদের কল্পনাগুলি সত্যি বলে প্রমাণ হচ্ছে।

He^4 বা চার ভরযুক্ত হিলিয়ম পরমাণুদের 'স্পিন'-এর মাপ শূন্য। তাই তারা 'বোসন' এবং বোসের নিয়ম মানে।

প্রকৃতিতে খুব কম পরিমাণে He^3 বা এমন হিলিয়মও পাওয়া যায় যার রাসায়নিক গুণ He^4-এর মতো হলেও ভর তিন আর 'স্পিন'-এর মাপ $\frac{1}{2}$। তাই তারা 'ফেরমিয়ন' এবং অতিসচল হবার কথা নয়। অনেক চেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণে He^3 আলাদা করে সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে সত্যিই 1·05 K পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলেও He^3 অতিসচল হয় না। এই তরলের গুণগুলিও অন্যরকম।

এ পর্যন্ত যাঁদের কাজের কথা বলা হল তাঁরা সকলেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই-সব কাজ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পদার্থবিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির যে-সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন হচ্ছে আর ক্রমশ আরো সত্যরূপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা কোয়াণ্টামতত্ত্ব গড়ে ওঠার মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কোন্ বৈজ্ঞানিক কাজের গুরুত্ব কতখানি তা বিচার করা হয় সেই কাজ থেকে কত নতুন কাজের পথ খুলে যাচ্ছে তার ভিত্তিতে। বোস স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স থেকে পাওয়া ফল— অনেক সম্পূর্ণ অভিন্ন কণার এক অবস্থায় জড়ো হবার সম্ভাবনার এই আপাত সহজ ধারণাটির প্রয়োগে আজ বহু বিজ্ঞানী নানা কাজে লিপ্ত হয়ে ক্রমশ বিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করছেন।

এমনি করেই পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানীরা একজনের হাত থেকে আর-একজন

মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে হাত-ধরাধরি করে এগিয়ে চলেন। একটাই প্রশ্ন— পথটি সত্য কি না। বয়স পদমর্যাদা দেশকালের ভেদাভেদ এই প্রশ্নের কাছে তলিয়ে যায়। ফুটবল খেলায় যেমন দলবদ্ধ ভাবে সকলেই গোলের দিকে লক্ষ রেখে সুচারু ভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় বল এগিয়ে দেয় বিজ্ঞানের খেলা তেমনি খেলা।

বেশ কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত আর ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানীরা যেখানে অবিরত জ্ঞানচর্চা করে ভাবের আদান-প্রদান করছিলেন, সেখানে প্রাচীন যুগের জ্ঞানচর্চা স্তিমিত হয়ে থাকা ভারতবর্ষের এক অখ্যাত কোণ থেকে অজ্ঞাতনামা বোসের পাঠানো স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ল কি করে? সে আর-এক ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজরা যখন আমাদের দেশে ব্যাবসা করতে এসে ধীরে ধীরে এদেশের ওপর প্রভুত্ব করতে শুরু করে দিল তখন আমাদের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা পুরনো পুঁথিতে কি আছে তা হয়তো কেউ কেউ বলতে পারতেন, কিন্তু নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রায় বন্ধ ছিল। অবশ্য মাটি, পাথর, সোনা, রুপো, কাঠের কাজ, সুন্দর কাপড় বোনা, চাষবাষ করত অনেক মানুষ। শিল্পসংগীতের চর্চাও ছিল।

ইংরেজ শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশের মাটিতে, খনিতে, বনে-জঙ্গলে যে-সব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা সংগ্রহ করে নিজেদের সম্পদ বাড়ানো। তাই এ-সব সন্ধানের জন্য নতুন অফিস তৈরি হল। সে-সব অফিসের কাজ চালানোর জন্য কিছু ভারতীয়কেও তৈরি করা দরকার ছিল। শাসকদের সঙ্গে খৃস্টান ধর্মযাজকরাও এসেছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরিত করা এবং এক ধরনের জনসেবা। ব্যতিক্রমও ছিল।

ইংরেজ শাসনে ধনসম্পদের ক্ষতি ও পরাধীনতার লাঞ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে দু দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা ভাব আদান-প্রদানও হল আর ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার খবরও একটু একটু করে এ দেশে পৌঁছল।

সব দেশেই সব সময় কিছু-কিছু আগ্রহী ও ক্ষমতাবান মানুষ থাকেন, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে তাঁরা ক্ষমতা ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। অবস্থা অনুকূল হলে তাঁরা কাজ করতে এগিয়ে আসেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছিলেন এই জাতের মানুষ। তাঁরা বুঝলেন আমাদের দেশের মানুষের পক্ষে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হওয়া কত প্রয়োজন। বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞানচর্চার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া কত প্রয়োজন। বিদেশী শাসন সম্বন্ধে মানুষের প্রতিবাদ থাকলেও বিদেশের খুঁজে পাওয়া জ্ঞানের প্রতি যাতে মানুষের বিমুখতা না আসে সেদিকে তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন। কেননা জ্ঞানের তো কোনো দেশ নেই, যার আকাঙ্ক্ষা হবে সেই পাবে।

রামমোহন তখনকার বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে পশ্চিমী রীতি-অনুযায়ী আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিলেন। দেশের অনেকেই তখন এ প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

রামমোহন ও ডেভিড হেয়ারের মিলিত চেষ্টায় ১৮১৭ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল কলকাতায়। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের নিয়ন্ত্রণ ভার সরকার গ্রহণ করলেন। কলেজের উচ্চ বিভাগের নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ আর নিম্ন বিভাগকে হিন্দু স্কুল নাম দেওয়া হল। কিন্তু এদেশে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিদেশী শাসকের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। মহেন্দ্রলাল সরকার নামে এক দরিদ্র অনাথ ছাত্র হিন্দু কলেজে ঢুকেছিলেন জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে। বিজ্ঞান শেখবার উৎসাহে ১৮৫৪ সালে কলেজে ভর্তি হলেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্‌যোগ চলছে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল ডাক্তারি পাস করে পরে বিখ্যাত ডাক্তার হলেন।

তখন খুব কম কলেজেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দেশের মানুষ ভাবতে শুরু করেছে বিজ্ঞান শিক্ষাই দেশকে আত্মনির্ভর করার, মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস আনার প্রধান পথ। সরকারী উচ্চ চাকরির জন্য কিংবা ব্যারিস্টারি পড়তে বিদেশ-যাত্রা তখন শিক্ষিত মহলে চালু হয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে কয়েকজন ছাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও বিদেশ যেতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ফিরে এসে এঁরা দেশে বিজ্ঞান শেখাবার ভার নিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার দেশজোড়া দৈন্য ও অজ্ঞতার কথা চিন্তা করে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন ১৮৭০ সাল থেকে। নানা কাগজে ইংরেজি বাংলায় তাঁর আবেদন-পত্র ছাপা হল। বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রমুখ অনেকেই এই উদ্‌যোগে সহায়তা করলেন। ১৮৭৫ সালের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে ১৮৭৬ সালের ২৯ জুলাই, ২১০ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠিত হল সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দিয়ে পরিচালিত হয়ে। পরে এই প্রতিষ্ঠানে

গবেষণা করে অধ্যাপক সি. ভি. রামন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এখন এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুরে বিরাট গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে। অনেক অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী গবেষণা করছেন। কিন্তু সে সময় খুব কম-সংখ্যক ভারতবাসী বিজ্ঞান-চর্চা করতেন। তাঁরা খুব কষ্টে বইপত্র জোগাড় করে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর অনুরাগের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

২

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনের পৈতৃক বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরেই জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে বিনা তারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাবার বিখ্যাত পরীক্ষা করে এ যুগের ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক উন্নত মানের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি দেশী কারিগরদের সাহায্যেই যন্ত্রপাতি তৈরি করাতেন। একটি দেশে অনেক মানুষ সহযোগিতা না করলে বিজ্ঞানের কাজ অগ্রসর হয় না। মহেন্দ্রলাল, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র সবেমাত্র সেই পরিবেশ সৃষ্টির উদ্‌যোগ শুরু করেছেন।

এই পরিবেশে শিশু সত্যেন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠতে লাগলেন। সাত সন্তানের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ— ডাকনাম বোদে— পরিবারের সকলের নয়নের মণি। বাবা কাজে বেরিয়ে যাবার সময় ছেলের দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য গুদাম ঘরের সিমেন্টের মেঝেতে অঙ্ক দিয়ে যেতেন, বালক সত্যেন মহানন্দে অঙ্ক কষতেন।

বাড়িটা তৈরি করেছিলেন ঠাকুরদা অম্বিকাচরণ। তিনি শিবপুর কলেজ থেকে পাস করে গভর্নমেণ্টের কমিসারিয়েটের কাজ করতেন। এলাহাবাদ, ঝাঁসী, ছন্দৌসী এই-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। হেড কোয়ার্টার ছিল মীরাটে। সত্যেন্দ্রনাথের বাবা সুরেন্দ্রনাথ যখন, বি. এ. পরীক্ষার জন্য ফি জমা দিতে যাবেন তখন খবর এল অম্বিকাচরণ অত্যন্ত অসুস্থ। মীরাটে গিয়ে দেখলেন তাঁর মৃত্যু

হয়েছে। আর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হল না। পড়াশুনায় অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সংসারের ভার নিয়ে কাজে যোগ দিতে হল। রেলের কেরানীর কাজ। ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসে।

সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা নদীর সংগম ত্রিবেণীর কাছে বড়ো জাগুলিয়া গ্রামে ৩০০ বছর আগে থেকে বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল। ঠাকুরদাদার প্রপিতামহ মধুসূদন চট্টগ্রামে নুনের গোলায় চাকরি করে কিছু টাকা রোজগার করে তান্ত্রিক হয়ে ফিরলেন খড়ম পায়ে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে। ক্রমে সাত পুরুষ দশ পুরুষ তফাত পাশাপাশি বসতি গড়ে ওঠে। মাইনগরের বসু পরিবার বনেদী বংশ বলে পরিচিত ছিল।

১৮২০ সালে অনেকে উত্তর দিকে চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে, হুগলী চুঁচুড়া এ-সব জায়গায়। এই-সব জায়গায় কলেজ ছিল। হুগলী থেকেই ঠাকুরদা পাস করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চন্দননগরে এক পিসির বাড়ি থাকতেন। সেখান থেকে হেঁটে আর নৌকো করে চুঁচুড়াতে যেতেন পড়তে। পুরনো হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নামের মধ্যেও তাঁর নাম আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মা আমোদিনী দেবী ছিলেন বোদরার বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্রথম তিনজন গণিতে এম. এ. পাস করেন। মতিলাল তাঁদের অন্যতম। পরে নাম-করা উকিল হয়েছিলেন। বউবাজার স্ট্রীট পার হয়ে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপরে একটা শিবমন্দিরের উল্টো দিকে বিরাট এক বাড়ি ছিল— সত্যেন্দ্রনাথের মামাবাড়ি। ওপরে হলঘর। ছাতের ওপর ভাইরা খেলা করতেন। মামাবাড়িতে সংগীত ও শিল্প -চর্চা ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের দু-তিন বছর পর নানা কারণে গোয়াবাগানের বসতবাড়ি ভাড়া দেওয়া হল। নিমতলা, দর্জিপাড়া নানা জায়গায় ভাড়া বাড়িতে থেকে আবার ন বছর বয়সে নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। পাঁচ বছর বয়সে জোড়াবাগানে বাড়ির সামনে নর্মাল স্কুলে পড়া শুরু হয়। এই স্কুলে রবীন্দ্রনাথও

কিছুকাল পড়েছিলেন। গোয়াবাগানে এসে বাড়ির কাছে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হলেন।

বাড়িতে থাকতেন মা, বাবা, কাকা, ছোটো পিসিমা। ছেলেবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে পড়ায় অসাধারণ মনোযোগ, আর বন্ধুবান্ধব জড়ো করে তাদের পড়া বুঝিয়ে দেবার অভ্যাস। অসাধারণ স্মরণশক্তি।

"একি ! বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেললি যে !" মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন।

"পড়া তো হয়ে গেছে। বুঝে গেছি তো !"

একবার বুঝলে আর দেখার দরকার হত না। ভবিষ্যতে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথেরও ছাত্রদের কাছ থেকে এমনি চাহিদা ছিল।

"তুমি যাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে শিখলে, ধরো তিনি মারা গেছেন— সব বই হারিয়ে, পুড়ে গেছে। যদি বুঝে থাক তবে নিজে আবার তা নিজের মতো গড়ে তোলো।"

একটা বই একটু খুলে দেখে টেবিলের অপর প্রান্তে দূরে সরিয়ে দিয়ে—নিজের নিয়মে অঙ্ক কষতে দেখা যেত। কোথাও একটু গোঁজামিল দেখলে একেবারেই বইটিকে সরিয়ে ফেলতেন। স্কুলে, কলেজে, কর্মজীবনে সব সময়ই একটা অঙ্ক বইয়ের নিয়মে করে তার পর দেখতেন আর কতভাবে করা যায়। এটা ছিল তাঁর মহা আনন্দের খেলা। এই মনোভাবই বিজ্ঞানে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

"তোমার পড়ার অসুবিধে হচ্ছে ? আমাদের বাড়িতে এসো। বোদে তোমায় পড়া বুঝিয়ে দেবে।" মা পাড়ার বন্ধুর ছেলেকে বাড়িতে ডেকে আনলেন। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র নীরেন্দ্রনাথ— পরবর্তী জীবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় —সদ্য স্কুলের পাঠ শেষ করা সত্যেন্দ্রনাথকে পরম গুরুর মতো ভক্তি করে স্কুলের পড়া পড়তে এল। বিজ্ঞান না পড়ে সাহিত্য পড়া সত্ত্বেও পড়া বোঝা আর আলোচনা বন্ধ হল না।

বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্যও স্কুল-জীবন থেকে পড়তে যেতেন। অনেক ছেলে পড়ছে। নিজের পড়া হত কখন ? বরাবর খুব ভোরে উঠতেন— ক্লাসের থেকে

অনেক এগিয়ে পড়া তৈরি হয়ে যেত। সারাদিন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নানা রকম গল্প, নানা রকম কাজ আর কখনো চিন্তায় মগ্ন।

পড়ানোর ব্যাপারে কোনো বিষয়ই বাদ যেত না। কলেজের বন্ধু অধ্যাপক অমরেশ চক্রবর্তী বলছেন, "আমার ছিল ফিজিক্স অনার্স— সত্যেনের ম্যাথম্যাটিক্স। গ্র্যাভিটেশন সম্বন্ধে আমাদের একটা প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন। ফার্স্ট প্রাইজ আমিই পেলাম। সত্যেন লিখে দিয়েছিল।" বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, "ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষার কিছু পূর্বে আমার মেজো ভাই মারা গেল— আমারও অসুখ হল। এক সপ্তাহের জন্য প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম।··· ভোরবেলা হঠাৎ সত্যেন এসে হাজির! বললাম··· এসিরিয়া হিটাইট কিছুই মনে পড়ছে না।··· সন্ধে ছটার মধ্যে জিনিসটা ঠিক করে দিল। পরীক্ষা ভালোই দিলাম।"

নিজের স্ত্রীকেও নানা বিষয়ে পড়াতেন।

স্কুলে পড়ার শেষ বছরে ঐতিহ্যমণ্ডিত হিন্দু স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৯০৮ সালে এনট্রান্স দেবার কথা— জলবসন্ত হওয়াতে দিতে পারলেন না। কিন্তু সেই বছর অনেক সংস্কৃত সাহিত্য আর পড়ার বইয়ের বাইরে অনেক দূর গণিত পড়ে ফেললেন। হিন্দু স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক উপেন বক্সী একবার তাঁকে পরীক্ষায় অঙ্কে ১০০তে ১১০ দিয়েছিলেন। কারণ ১১টির মধ্যে ১০টি অঙ্ক করার কথা কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ১১টিই নির্ভুল করেছেন আর-কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে। উপেনবাবু মন্তব্য করেছিলেন যে সত্যেন একদিন লা প্লাস বা পাইথাগোরাসের মতো বিরাট গণিতজ্ঞ হবেন।

এর মাঝখানে সুরেন্দ্রনাথ ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসে একটা অসংগত ব্যবহার পেয়ে বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। তখন সত্যেন্দ্রনাথের ছ বছর বয়স, ছোটো দুই বোনও হয়েছে। চন্দননগরের পিসেমশায়ের এক ভাই সতীশ ব্রহ্মর সঙ্গে মিলে ভাবলেন ব্যাবসা করবেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় -প্রবর্তিত বেঙ্গল কেমিক্যালে সতীশচন্দ্রর কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। বাড়ির কাছে

একটা ফাঁকা জায়গায় 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওঅার্কস্' বলে এক ওষুধ আর কেমিক্যাল তৈরির কারখানা গড়ে তুললেন। বই থেকে ফরমুলা দেখে ওষুধ তৈরি করেন— জোয়ানের আরক, কালমেঘ আর টনিক, নাম দিলেন 'অশ্বগন্ধা ওয়াইন'। নাইট্রিক অ্যাসিডও তৈরি করলেন। প্রায় সমবয়সী কাকার সঙ্গে শিশু সত্যেন্দ্র উৎসাহভরে এ-সব দেখতেন আর মাঝে মাঝে শিশিতে লেবেল আঁটতেন। সতীশবাবু বিক্রির দিকটা দেখতেন। কিন্তু ব্যাবসা দাঁড়াল না। ক্ষতি হতে থাকল। ছাতা মাথায় টিউশনিও করতে যেতেন। ১৯০১ থেকে চার বছর পর্যন্ত কষ্ট করে চালালেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রসদ ফুরচ্ছে— সত্যেন্দ্রনাথের মায়ের গয়নাও শেষ হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েতে ধুবড়ি থেকে গৌহাটি, নতুন রেললাইন পাতার কাজ শুরু হতে হিসাব-রক্ষকের চাকরিতে যোগ দিলেন।

বাবার চরিত্রের অনেক দিক পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ— দুজনের চেহারাও একরকম ছিল। তাঁর যেমন বাবার প্রতি ভক্তি আর ভালোবাসা ছিল, তেমনি সমবয়সীর মতো বন্ধুত্বও ছিল। বাবা ধর্মকর্ম করতেন না কিন্তু হিন্দু- শাস্ত্র দর্শন সব-কিছু খুব ভালোভাবে পড়েছিলেন। কমিউনিজম-সংক্রান্ত বইগুলিও তেমনি মন দিয়ে পড়ে ফেলেছিলেন।

•

১৯০৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন। এর পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্সে ভর্তি হলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা হিন্দু স্কুলের ভালো ছেলেদের খবর রাখতেন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সত্যেন বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানবিভাগে ভর্তি হয়েছেন শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার সম্ভাবনায়।

কিন্তু ছেলেটি শুধু ভালো ছেলে তো নয়— মাথায় সব সময় দুষ্টু বুদ্ধি। সবার সঙ্গে ভাব আর মজা -করা। তখন জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।

সেই বছরই প্রেসিডেন্সি কলেজে আরো কয়েকজন মেধাবী ছাত্র ভর্তি হলেন যাঁরা ভবিষ্যতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন : জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার, নিখিলরঞ্জন সেন ও অমরেশ চক্রবর্তী। মেঘনাদ সাহা দু বছর পরে যোগ দেন।

অমরেশ ছিলেন ভালোমানুষ প্রকৃতির। তিনি স্মৃতিচারণে বলছেন, "প্রথম দিন ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছি। দেখতে ছোটোখাটো ছিলাম। দু-তিনটে বেঞ্চ টপকে লাফাতে লাফাতে 'আমি খোকার পাশে বসব' বলে বসে পড়ল। সবাই চেঁচাচ্ছে—হাসছে আর বলছে ওকে বসতে দিও না, দুর্বুদ্ধি শেখাবে। সবাইকে জড়ো করে নিয়ে নানা ভাবে অঙ্ক কষার খেলায় ডাক দিত। কখনো-বা একাই একমনে অঙ্ক কষছে। কখনো ছাগলের মুখ আঁকল, কখনো এস্রাজের গৎ বানালো— চোখে ঠুলি বেঁধে ধরাবাঁধা পথে যাবার ছেলে ছিল না···"— নানা পথে মন ঘুরে বেড়াত, চঞ্চল অথচ সুস্থির মন। যে-মন নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারে আর চিরন্তন সত্যকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে পারে।

প্রফুল্লচন্দ্রকে সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। দেশের ছেলেদের বিজ্ঞানে শিক্ষিত করতে, বিজ্ঞানের প্রয়োগে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করতে তিনি যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে-আদর্শ সত্যেন্দ্রনাথকে পরবর্তী জীবনে সব চেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু ক্লাসে সত্যেনের দুষ্টুমি সামলাতে না পেরে নিজের চেয়ারের পাশে টুল পেতে বসিয়ে রাখতেন। বুদ্ধিদীপ্ত, গতানুগতিক থেকে অন্য রকম নানা প্রশ্নে অধ্যাপকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। সেই দুষ্টু বুদ্ধি শেষ বয়স পর্যন্ত ছিল। জার্মানীতে আলোচনা-চক্রে দুরূহ বিষয়ের বক্তৃতা শুনতে গিয়ে নানা দিকের অসংগতি খুঁজে বের করে বক্তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। পরে কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে বললেন, "খিদে বাড়াবার জন্য এই-সব করছিলাম। চলো, খেয়ে আসা যাক্।"

অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে অনবরত দান করতে করতে শেষ জীবনে হাতে

টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। নিজের একটা গাড়ি রাখতে পারেন নি। তখন শরীর অশক্ত— তাই কেউ গাড়ি নিয়ে এসে কোথাও নিয়ে গেলে বেরোতে পারতেন।

"বল্ তো আমি কে?" অমরেশ চক্রবর্তী আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে টেলিফোনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পারলেন।

"একটা গাড়ি পেয়েছি, চল্, ছোটোবেলার মতো আড্ডা দেব।"

গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধুকে তুলে সারা কলকাতা ঘুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ঘরে সারাদিন আড্ডা চলল মৃত্যুর কিছুকাল আগে, ৮০ বছর বয়সে। মধুর স্মৃতি মন্থন করে বন্ধুদের চোখ জলে ভরে ওঠে।

যৌবনে সত্যেন্দ্রনাথকে দেখা যেত মাইলের পর মাইল বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে করতে মগ্ন হয়ে চলে যেতে। কখনো-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গানের আসরে, সাহিত্যচর্চায়, তাস-দাবা খেলতে, এস্রাজ বাজাতে; দর্শন— ফরাসী, জার্মান, ইটালীয় ভাষায় পড়তে। একদিন বন্ধু অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা, লোকে বলে এমন বিজ্ঞানের মাথা নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করা উচিত না।" স্বভাবসিদ্ধ সহজ হাসির সঙ্গে উত্তর হল, "জ্ঞানের রাজ্যে এখন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন চলছে। কোনো বিষয়ের জ্ঞানকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন— এদের শিকড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই ভালো কিছু করতে গেলে চট করে করা যায় না, সময় লাগে।"

সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র, পরবর্তী কালে অধ্যাপক, অশোক বোস বলছেন, "মাস্টারমশায়ের ছিল ৫ বছর লাগুক, ১০ বছর লাগুক— তলিয়ে দেখ! অনন্ত কাজ!"

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তরুণদের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। তেমনি একটি সমিতি ছিল অনুশীলন সমিতি, যার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। 'ওয়ার্কিং মেন্‌স্ ইনস্টিটিউট' নামে নৈশ স্কুলে

সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষা পরিচালনা করতেন। সঙ্গী ছিলেন বাল্যবন্ধু নীরেন্দ্রনাথ, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, পশুপতি ভট্টাচার্য ও হরিশ সিংহ। পরবর্তী জীবনে ঢাকায় অধ্যাপনার সময়েও সন্ত্রাসবাদী দেশসেবীদের গোপনে সাহায্য করেছেন।

১৯১৪তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রকে পদার্থবিদ্যার ইংরেজ অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব অপমান করেন। খবরটি প্রকাশ হওয়া মাত্র সারা কলেজে ধর্মঘট শুরু হয়। সত্যেন্দ্রনাথ কলেজের মাঠে বক্তৃতা দিলেন এ জাতীয় অপমান সহ্য না করার জন্য। সারাদিন পর হ্যারিসন সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন আর হাঙ্গামা মিটে গেল।

আইনস্টাইন একবার কথা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যদি তুমি জান যে একটা সুইচ আছে যেটা টিপলেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবে কিন্তু দেশে অনেক সমস্যা দেখা দেবে তবে তুমি কি করবে?"

উত্তর হল, "আমি এক্ষুনি সে সুইচটা টিপব।"

"হয়তো অরাজকতা হবে, ওরা তো কিছু আইনের শাসন দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।"

"এটা যুক্তির প্রশ্ন নয়, মনের আবেগের প্রশ্ন।"

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের দিনটির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে বাঙালির ঐক্যের গান রচনা করলেন আর সেই দিন রাখী বন্ধনের প্রবর্তন করলেন। এগারো বছরের সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন দল বেঁধে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গেয়ে রাস্তায় ঘুরেছেন।

কলেজ-জীবনে বিকেলে হেদোতে আড্ডা জমত। নীরেন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যেতে চাইলেন বাড়িতে রাগ করবে বলে।

"বোস্, কোথায় যাচ্ছিস? বাড়িতে প্রথম দিন বকবে, দ্বিতীয় দিন বকবে—তার পর কেউ বকবে না।" আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন নিয়ম ছিল শ্রমজীবীদের জন্য নাইট স্কুলে সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে হবে।

৩

কলেজে বিজ্ঞান ছাড়াও পার্সিভাল সাহেবের কাছে ইংরেজিতে ফার্স্ট হয়ে নম্বর পেলেন ৬০+১০। বাড়তি ১০ নম্বরের সঙ্গে মন্তব্য : "ছেলেটি অসাধারণ, এর নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে।" আই. এস্‌সি. -তে ফার্স্ট হবার পর গণিতে অনার্স নিয়ে বি. এস্‌সি. পড়া শুরু হল। এই সময়ে আর-এক জন মেধাবী সহপাঠী পেলেন— মেঘনাদ সাহা। বি. এস্‌সি. ও এম. এস্‌সি. মিক্‌স্‌ড্ ম্যাথম্যাটিক্‌সে যথাক্রমে সত্যেন্দ্র প্রথম ও মেঘনাদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এম. এস্‌সি.-র আটটি প্রশ্নপত্রের ছুটিতে সত্যেন বসু পেলেন ফুল মার্ক্‌স্, দুটিতে ৯৬-এর কাছা-কাছি আর সব চেয়ে কম নম্বর ৮৮। এম. এস্‌সি. পরীক্ষার এক বছর আগে ১৯১৪ সালে কুড়ি বছর বয়সে কম্বুলিয়াটোলার ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান উষাবতী দেবীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

১৯১৫ সালে এম. এস্‌সি. পাস করলেন। এ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা পরিচালনার প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সময়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন রূপ নিল। উচ্চতম জ্ঞান অনুশীলনের জন্য নতুন নতুন বিভাগ খোলা হল। স্যার রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চয়ের বিরাট অংশ ও খয়রাগড়ের রানী প্রচুর টাকা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য। শর্ত ছিল অধ্যাপকদের ভারতীয় হতে হবে।

কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ অধ্যাপক কই? সদ্য পাস-করা ২১।২২ বছরের সত্যেন্দ্র, মেঘনাদ, শৈলেন ঘোষ আশুতোষের প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা নিশ্চয়ই পড়াতে পারব।"

এম. এস্‌সি. ক্লাসে ওঁরা গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান দুই বিষয়েই পড়াতে শুরু করলেন। স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে শৈলেন ঘোষ নিরুদ্দেশ হলে সত্যেন্দ্র আর মেঘনাদ সাধারণ গতানুগতিক ভাবে নয়, পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম

আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পড়াতেন। পড়ানোর বিষয়ে আলোচনা আর পরামর্শ হত দুই বন্ধুতে। ইউরোপে সে সময় যেমন অনেকে পদার্থবিদরূপে গণ্য হয়েছেন— যাঁরা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে কাজ করতেন এখানে তো তেমন ছিল না। এঁরা নিজেদের মেধা, জ্ঞানের পিপাসা আর দেশ গড়ে তোলার অদম্য আগ্রহ সম্বল করে কঠিন পরিশ্রম করে কাজ শুরু করলেন।

বই জোগাড় করা সহজ ছিল না। খবর পাওয়া গেল বটানিকাল গার্ডেনে এক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ ব্রুলের সাহেবের কাছে কিছু পদার্থবিজ্ঞানের বই আছে। দুই বন্ধু ছুটলেন সেখানে বই সংগ্রহ করতে। কয়েক বছরের বড়ো দেবেন্দ্রমোহন বসু জার্মানীতে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে আটকে পড়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে কিছু বই দিলেন। এমনি করে চলল বিশ্ব-বিজ্ঞানের খবর সংগ্রহ। দুজনে জার্মান ভাষা শিখে ফেললেন। ফরাসী ভাষা সত্যেন্দ্রনাথ আগেই শিখে নিয়েছিলেন।

আইনস্টাইনের নতুন আবিষ্কার 'আপেক্ষিকতত্ত্ব' যা নিয়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, যার নতুনত্ব সবাইকে চমকে দিয়েছে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের যা বুঝতে বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে, দুই বন্ধুতে মিলে সেই বিষয়ে জার্মান ভাষায় লেখা আইনস্টাইনের গবেষণা-পত্রগুলি পড়ে তার ইংরেজি অনুবাদ করে ফেলেন। সারা পৃথিবীতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের সেটা প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

এই সময়ে ওঁর পড়ানো সম্বন্ধে গণিতবিদ জ্যোতির্ময় ঘোষ লিখছেন, "১৯১৭ সালে ছাত্র হিসাবে বাংলার বুদ্ধি ও সংস্কৃতি জগতের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল— যাঁর সম্বন্ধে জানা ছিল কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন নি, যাঁর চশমার পাওয়ার ছিল মাইনাস ১৫, আর যিনি এম. এস্‌সি. পরীক্ষার পর অবসর বিনোদনের জন্য জিন্‌সের ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগনেটিজ্‌ম-এর বই পড়তেন আর উইটেকারের মডার্ন অ্যানালিসিস-এর কঠিন অঙ্ক কষতেন। দুরূহ অঙ্কের বইয়ের আর সদ্য প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সারমর্ম

বিদ্যুদ্‌বেগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে ব্যাখ্যা করে ব্ল্যাকবোর্ড ভরিয়ে ফেলতেন। তাঁর হাতে কোনো লেখা নোট থাকত না। সম্পূর্ণ স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে লিখে যেতেন।”

ক্রমশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান -চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরে সি. ভি. রামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হয়ে আসেন। সব জ্ঞানপিপাসু মানুষ কলকাতায় কি ঘটছে জানতে চাইতেন। দেশে জ্ঞানচর্চার নতুন উদ্দীপনা দেখা দিল।

পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চলল গবেষণার কাজ। বোস স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স-এর কথা আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে জনসাধারণের অনেকে এ বিষয়ে শুনেছেন। সেইজন্যে অনেকেই ভাবেন সত্যেন্দ্রনাথ বুঝি ঐ একটা কাজই করেছেন। কিন্তু ক্রমাগত চিন্তা, পরীক্ষা আর পরিশ্রম করার অভ্যাস না থাকলে হঠাৎ ঐরকম কাজ করা যায় না। আর যাঁরা এমন কাজ করেন তাঁদের চিন্তার অভ্যাসও চিরজীবন চলে— চিন্তা না করে তাঁরা থাকতেই পারেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রথম গবেষণা-পত্র প্রকাশ হয় ১৯১৮ সালে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যুক্তভাবে লণ্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন'-এ। আদর্শ গ্যাসের অণুগুলিকে বিন্দু ধরে যে সমীকরণ তৈরি হয়, অণুগুলির সীমিত মাপ বিবেচনা করলে তার কি পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে অঙ্ক তৈরি করাই ছিল এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ১৯১৯-এ প্রকাশিত হল 'বস্তুর আভ্যন্তরিক বল সাম্যের সমীকরণ' এবং 'ঘূর্ণন অক্ষপথের জ্যামিতি'— এই দুটি সম্পূর্ণ গণিত বিষয়ে প্রবন্ধ। ১৯২০তে আবার মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যুক্ত ভাবে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার এক সমীকরণ গড়ে তোলেন যার নাম হয় 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ'। আর-একটি প্রবন্ধ কোয়াণ্টামতত্ত্বর সাহায্যে বর্ণালীর বিবরণ-বিষয়ক একটা নিয়ম সম্বন্ধে। এ দুটিই প্রকাশিত হয় 'ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন'-এ। তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত এই পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যেই গণিত-ব্যবহারের অভিনব সৌন্দর্য দেখা যায়।

৪

১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলকাতা ছেড়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হয়ে চলে যান। ক্রমে দেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠতে থাকে। মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে চলে গেলেন। সেখানে ছাত্রদের নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা শুরু করলেন।

ঢাকা যাবার তিন বছর পর ১৯২৪ সালে প্লাঙ্ক-সূত্র সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সর্ববিখ্যাত গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়। ২ জুলাই এই প্রবন্ধটি পাঠাবার এক সপ্তাহ পরে আর-একটা বড়ো প্রবন্ধ আইনস্টাইনকে পাঠান যার বিষয়বস্তু ছিল 'বস্তুর উপস্থিতিতে বিকিরণ ক্ষেত্রে তাপ-সাম্য'। এই প্রবন্ধটিও আইনস্টাইন নিজে অনুবাদ করে পূর্বোক্ত জার্মান পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে প্রবন্ধটি আলোচনা করে একটা বড়ো মন্তব্য করেন— শুধু একটা অংশের কল্পনার সঙ্গে তাঁর মতভেদ ব্যক্ত ক'রে। জার্মানী যাবার পর এ প্রবন্ধ বিষয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা হয় কিন্তু দুজনে একমত হতে পারেন নি।

১৯২৫ সালে ঢাকা থেকে দু বছরের ছুটি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ফ্রান্স ও জার্মানী গেলেন। ছুটি পেতে প্রথমে অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা-পত্রের সম্বন্ধে আইনস্টাইনের প্রশংসাসূচক চিঠি দেখে কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে রাজী হলেন।

প্রথম বছরটা ফ্রান্সে কাটান। মাদাম কুরীর গবেষণাগারে তখনকার কালের আধুনিক পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। কিছুকাল লুই দ্য ব্রগলীর দাদা মরিস দ্য ব্রগলী (Maurice de Broglie)-র গবেষণাগারে এক্স-রে দিয়ে ক্রিস্টালের গঠন নির্ণয় বিষয়েও পরীক্ষামূলক কাজ করেন।

এর পর বের্লিনে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। যাবার আগেই আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের কাজের সম্বন্ধে বের্লিন অ্যাকাডেমিতে বেশ কিছুদিন আলোচনা করেছেন। যুবক সত্যেন্দ্রনাথ হয়তো ভেবেছিলেন আইনস্টাইনের তত্ত্বাবধানে ছাত্র হয়ে কিছুদিন গবেষণা করবেন। কিন্তু প্লাঙ্ক, লাউয়ে (Laue),

নের্নস্ট (Nernst), হাবের (Haber) প্রমুখ দিক্‌পাল প্রবীণ বিজ্ঞানীদের কাছে এই ব'লে আইনস্টাইন পরিচয় দিলেন, "এই সেই বোস এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে।" অর্থাৎ এই-সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমান পর্যায়ে আলোচনাচক্রে বসিয়ে দিলেন। কিছুদিন এখানে নানা আলোচনায় মহানন্দে কাটল।

প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু বিজ্ঞানী হেরমান মার্ক (Hermann Mark) স্মৃতিচারণে বলছেন, "১৯২৫ বা ২৬ সালে বের্লিনে একটি বিখ্যাত সেমিনার হয়— বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্‌স-এ। এতে প্লাঙ্ক, লাউয়ে, হাবের, নের্নস্ট, অটো হান (Otto Hann), লিজে মাইটনার (Lise Meitner) ইত্যাদি বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যোগ দেন। লাউয়ে সেমিনার পরিচালনা করতেন। ...সাধারণত তরুণ পদার্থবিদদের গবেষণা-পত্র পড়তে দিতেন আর অভিজ্ঞ বয়স্ক অধ্যাপকদের মন্তব্য করতে বলতেন। বোস তার মধ্যে একদিন সেমিনার দেয়— সেদিনই আমি তাকে প্রথম দেখি। ...সেখানে নের্নস্ট বসে ছিলেন, প্লাঙ্ক বসে ছিলেন, আইনস্টাইন বসে ছিলেন। সাধারণত বক্তৃতার শেষে লাউয়ে বলতেন, 'বেশ, ভালো, কোনো প্রশ্ন আছে কি?'— সেদিন বললেন এই বিষয় সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট পরিচিত নই, অধ্যাপক আইনস্টাইনকে আমি মন্তব্য করতে অনুরোধ করছি। আইনস্টাইন বললেন, 'এই কাজটি গত কয়েক বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের অন্যতম বলে আমি মনে করি।' নের্নস্ট প্রশ্ন করলেন— আলোচনা হল। সে দিনটা ছিল একটা বিশেষ সাড়া-জাগানো দিন। কারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল।

"আমরা ডালহেম কাইজার উইলহেল্‌ম ইনস্টিটিউটে তাকে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করলাম। সে প্রায়ই আসত— আমাদের কাজ সম্বন্ধে নানা আলোচনা করত। বোস সম্বন্ধে আমাদের সকলের ঠিক যা ধারণা ছিল তা এইরকম: সে যখন বিজ্ঞানের কোনো নতুন কাজের ধারার সম্মুখীন হত— একটুক্ষণ বসে শুনত— সেই বিষয়ের মূলগতভিত্তির ওপর তার আশ্চর্য দখল দেখা যেত। তার পর সে প্রশ্ন করত— সেই প্রশ্ন শুধু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন নয়— প্রশ্নগুলি তীক্ষ্ণভাবে

সেই কাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ধারার দিক্ নির্দেশ করত।

"বোস, আইনস্টাইন এঁরা ছিলেন গ্রীক দার্শনিকদের মতো— সক্রেটিসের মতো। ইনস্টিটিউটের কাছেই একটা সুন্দর পার্ক ছিল, ওঁরা দুজন সেখানে চলতে চলতে কথা বলতেন, আলোচনা করতেন।" হেসে বললেন, "আর সে-সব প্রকাশ করেন নি।"

মার্ক বলছেন, "সকলের সঙ্গে মজা ঠাট্টা তামাশা করত, বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জার্মান গানের আসর পরিচালনা করত।"

১৯২৪-২৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে যে মূলগততত্ত্বের বিরাট আলোড়ন চলছিল তার ঢেউ সব চেয়ে আগে বের্লিনে এসে পৌঁছত। তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে, গবেষণাগারে চায়ের আসরে সব জায়গায় সর্বদা তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা হত। সত্যেন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে বলছেন :

"আইনস্টাইন তো ক্লাসটাস নিতেন না, বাড়িতে লোকজন ডেকে কথাবার্তা বলতেন— সেই সময়ে হাইসেনবার্গের পেপার বেরিয়েছে, তা নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক হল— 'এ কি বলছে রে বাবা'। শ্রয়েডিঙ্গার এলেন, বক্তৃতা দিলেন— সবাই উল্লসিত— এবার বোধ হয় একটা সমাধান পাওয়া গেল। আমরা সবাই মিলে রেস্তোরাঁতে আলোচনা করতাম গবেষণা-পত্র প্রকাশ হবার তিন-চার মাস আগে থেকে। এরেনফেস্ট আলোচনায় খুব উৎসাহী ছিলেন।"

নিজের কাজে ডুবে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করতে হলে এই পরিবেশে তাত্ত্বিক কাজ করাই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পক্ষে সুবিধাজনক হত। অন্য কেউ হলে হয়তো তাই করতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশ যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষামূলক গবেষণায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশের ছেলেদের তৈরি করা। বিদেশের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করলেই কোন্ বিজ্ঞানী দেশের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির জন্য কি করছিলেন সেই গল্প করতেই ভালোবাসতেন। হাবের যে দেশে অপ্রচুর নাইট্রোজেন-সংবলিত খনিজ ছিল বলে দেশের জন্য বাতাসের থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন তৈরির উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন এ কাজের কথা প্রায়ই

বলতেন। একে খুব বড়ো কাজ বলে ভাবতেন। তাত্ত্বিক কাজ তো মেধাবী পণ্ডিতরা করবেই, সে কাজ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। যা বোঝার প্রয়োজন নিজে পড়ে-কষে বুঝে নেবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, "বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে আধুনিক কালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পাঠ গ্রহণ করা উচিত। হয়তো জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখাই ভালো। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকেই দর্শনের প্রধান বিষয় করা ঠিক নয়। বরং সাধারণ ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত দেশবিদেশের মানুষকে মনে করা যেতে পারে যেন এক 'রিলে দৌড়ের' প্রতিযোগী, যেখানে ব্যক্তিগত দৌড়বাজের ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ পরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু ঐ-সব প্রয়াস দেশের ও জগতের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে— এইটাই হচ্ছে আসল কথা।"

১৯২৭ সালে প্রফেসর ও অধ্যক্ষ পদে ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকে লেগে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তোলার কাজে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ডক্টরেট ডিগ্রি নেই বলে প্রফেসর পদ দিতে কর্তৃপক্ষের কিছুটা আপত্তি ছিল কিন্তু 'বের্লিনে এঁর উপস্থিতিতে আমরা উপকৃত হয়েছি' আইনস্টাইনের এই মন্তব্য উপেক্ষা করা চলল না। ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকজন সুযোগ্য সহযোগীকে নিয়ে এলেন— রামনের সহযোগী কে. এস. কৃষ্ণান রীডার হয়ে এলেন— আর এলেন সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পদার্থবিদরা যাঁরা ভবিষ্যতে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে, মুষ্টিমেয় লোকবল, সামান্য যন্ত্রপাতি বইপত্র সম্বল করে শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থাপনা করতে লাগলেন। পরবর্তী নয়-দশ বছর তাঁর কোনো গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয় নি, খ্যাতি বিস্তার হয় নি কিন্তু কাজ হয়েছে।

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর তাঁর স্মৃতিচারণে বলছেন, ১৯২৭ সালে বার্কলা (Barkla)-র কাছে রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে কাজ করার পর দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর সত্যানুসন্ধানে বিশেষ সাহায্য হয় যার ফলে তিনি 'ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন'-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

টি. আই. এফ. আর.-এর পদার্থবিজ্ঞানী নন্দদুলাল সেনগুপ্ত বলছেন, "... আমার নামে কলকাতা গণিত সভার মুখপত্রে প্রকাশিত (১৯৪৯) তত্ত্বীয় পদার্থবিভায়, গবেষণা-পত্রে ওঁর হাতের ছাপ ছিল গভীর ভাবে। ডিরাক সমীকরণের রশ্মি বিকিরণের ক্ষেত্রে সঠিক সমাধানটা কি রকম হবে তা উনি সম্পূর্ণ কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর ঐ সমাধানটা বিদ্যুৎকণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে যে ফল পাওয়া গেল তা তৎকালীন চলতি ধারণাতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। ... ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে 'লেসার' আবিষ্কারের পর অনেকের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এবং ১৯৬২ সালে ও তার পর অনেকেই ঐ একই সূত্রে উপনীত হয়।" এমন পরোক্ষ কাজের অনেক নিদর্শন আছে। ঢাকায় অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে প্রায় পনেরো-ষোলো জন গবেষণা ও শিক্ষকতা করতেন। কৃষ্ণান ঢাকায় চুম্বকত্ব সম্বন্ধে কাজ করে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল অধ্যাপক বসুর মনীষা আর অনুপ্রেরণা।

ভারতবর্ষে প্রথম এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির কাজ শুরু হয় ঢাকায় অধ্যাপক বসুর চেষ্টায়। কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির যে কাজ করেন বিজ্ঞান-জগতে তার বিশেষ সমাদর হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি কারখানা তিনি গড়ে তোলেন দেশী কারিগরদের সাহায্যে। উচ্চাঙ্গ গবেষণার জন্য নানা রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, এক্স-রে ক্যামেরা ইত্যাদি সেখানে তৈরি হয়।

প্রায় দশ বছর এই-সব গড়ে তোলা, অন্যকে উৎসাহদান করে কাজ করানোতে আত্মনিয়োগ করলেন। নিজে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিভায় কাজ করে চলেন কিন্তু গবেষণা-পত্র প্রকাশের দিকে মন ছিল না। আবার ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

কোনো সমস্যার বিশেষ জটিলতার জন্য সমাধান সম্ভব হচ্ছে না এমন খবর কেউ জানালে সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠতেন সমাধান করে দেবার জন্য। ঢাকায় পরীক্ষা নিতে বিজ্ঞানী বন্ধুদের ডাকতেন— তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলত অধ্যাপক বসুর ঘরে ঘরোয়া ভাবে। সি. ভি. রামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশির মিত্র, বিধুভূষণ রায়, মেঘনাদ সাহা— এঁরা আসতেন। একবার মেঘনাদ সাহা এলেন এলাহাবাদ থেকে। ঢাকায় বক্তৃতা দিলেন। তখন আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন বিষয়ে কাজ করছিলেন। সেই বিষয়েই বক্তৃতা দিলেন। বিরাট ভিড় হয়েছিল বক্তৃতা শুনতে। সেই সময়ে তিনি একটা দুরূহ জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বন্ধু সত্যেনকে অনুরোধ জানালেন। মেঘনাদ সাহা আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের একটি নতুন শর্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই শর্ত প্রতিষ্ঠিত করতে অনুমান করতে হয় যে আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণ হয় না। তিনি নিজেই জানতেন এ অনুমান ঠিক নয় তাই প্রকাশ্য সভায় সত্যেন্দ্র-নাথকে অনুরোধ করলেন কোনো অনুমানের ওপর নির্ভর না করে সাধারণ ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে। দু-তিন দিন এ বিষয়ে গভীর মনোনিবেশে সমস্যা সমাধান করে সত্যেন্দ্রনাথ একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন।

এইভাবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে নানা জনের উৎসাহে পর পর দশটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নানা রকম বিষয়ে। আয়নমণ্ডলের বিষয়ে আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন অধ্যাপক খাস্তগীরের সঙ্গে যুক্তভাবে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উৎসাহে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স বিষয়ে দুটি, এবং পরে নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স বিষয়ে, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ডিরাক সমীকরণ সংক্রান্ত, হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত, তা ছাড়া গণিত আর জৈব রসায়ন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি এত বিস্তৃত বিষয়ে যে তার আলোচনা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাজ। গণিত-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যেখানেই সত্যেন্দ্রনাথ গণিতের প্রয়োগ করেছেন অভিনব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

ঢাকায় সকাল থেকে সারাদিন কলেজে কাটাতেন। দেখা যেত মাঠে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় ছোটো টেবিল পেতে বসে বসে অঙ্ক কষছেন। মিস্ত্রী, অধ্যাপক, ছাত্র, কারো সঙ্গে ভেদাভেদ জ্ঞান নেই, সকলের সঙ্গে গলা জড়িয়ে গল্প করছেন। বাড়িতে বাগান করতে ভালোবাসতেন। নিজের হাতে অনেক কাজ করতেও ভালোবাসতেন। স্নেহশীল পিতা— ছেলেকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে দিতেন। মানুষকে যত্ন করার, সাহায্য করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল। বিশেষ করে অক্ষম-অসহায়কে।

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর স্মৃতিচারণে বলছেন, "পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ··· মাঝে-মাঝে হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি হত। এই অবস্থায় তাঁকে সামলানো খুবই মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কতবার দেখেছি পুণ্যেন্দ্রনাথের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে শুশ্রূষা করেছেন, নিজের হাতে দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন এবং স্নান করিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। ···বড়ো-ছোটো, ধনী-দরিদ্র, পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দানের সাগর বলা হয়। আমাদের সত্যেন্দ্রনাথকেও ঐ একই আখ্যা দিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।"

যার যা প্রয়োজন মেটাতে অকাতরে দান করতে করতে ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর ঋণ হয়, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়ে সে ঋণ শোধ করে ১৯৪৫-এ ঢাকার কাজের পর্ব শেষ করে আবার কলকাতায় খয়রা-অধ্যাপক পদ পেয়ে ফিরে আসেন।

৫

কলকাতায় এসে সত্যেন্দ্রনাথ এক্স-রে গবেষণাগারের ভার নেন। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এই গবেষণাগারে নানা ধরনের বিষয়ে কাজ করতে থাকেন। অধ্যাপক বসু -পরিচালিত এই গবেষণাগারের নিয়ম ছিল প্রত্যেকের কাজের জন্য যন্ত্রপাতি নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে। ল্যাবরেটরির কারখানার মিস্ত্রীদের সাহায্যে

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে সকলে কাজ করত। এতে সকলের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠল। গবেষকদের অনেকেই পরে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জগতের কাজের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়েছেন। ঘরে ঘরে সকলের কাজের খোঁজ নিতেন। কারো কোনো অসুবিধা হলে যখন খুশি নির্ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করত। গণিত, রসায়ন— নানা বিভাগ থেকে অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী আসতেন তাঁদের বিষয়ে আলোচনার জন্য।

জগদীশ শর্মা পরীক্ষামূলক গবেষক-ছাত্র হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করছেন, "মাস্টারমশায়ের সাংঘাতিক ইণ্টারেস্ট ছিল একসপেরিমেণ্টে। টেবিলে বসে ঠিক কল্পনা করে বুঝতে পারতেন কী কী অসুবিধা হচ্ছে— কোথায় ভুল হতে পারে, কিসের জন্য কী করা দরকার। প্রত্যেক দিন অনেকগুলো কাজের প্ল্যান দিতেন কিন্তু সে-সব করার উপযুক্ত ব্যবস্থা তখন ছিল না। তার মধ্যে যেগুলো আমার পক্ষে সম্ভব তাই করে গবেষণা শেষ করে থীসিস দিতে পেরেছি।"

এই সময়ে তিন-চার জন গবেষক অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে 'তাপালোক-প্রভা' বা 'থার্মোলুমিনেসেন্স' (thermoluminescence) বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কোনো বস্তুর ওপর কিছুক্ষণ এক্স-রে ফেলা হলে তা থেকে শক্তি নিয়ে বস্তুর ভেতর ইলেকট্রন স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান আলো রূপে সে শক্তি ছেড়ে দেয়। বস্তুটি গরম করলে বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাপের সঙ্গে দীপ্তির বর্ণালীর বিশেষ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। এর মাপ থেকে বস্তুর ভেতরে ইলেকট্রন কত রকম শক্তি নিয়ে থাকতে পারে তা জানা যায়। কিন্তু মাপার অসুবিধা হল কারণ এই দীপ্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। খুব দ্রুতবেগে এই ক্ষণস্থায়ী থার্মোলুমিনেসেন্স বর্ণালীর ছবি তোলার একটা উপায় উদ্ভাবন করে একটি অত্যন্ত কার্যকরী সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা দিলেন অধ্যাপক বসু। খয়রা ল্যাবরেটরিতে সেই যন্ত্রটি তৈরি করা হল। জগদীশ শর্মা বলছেন, "এই যন্ত্রের কল্পনা, প্ল্যান, ডিজাইন সব মাস্টারমশাই করেছেন। অত দ্রুতবেগে সম্পূর্ণ বর্ণালীর ছবি তোলার উপায় কেউ আগে বের করতে পারে নি। এই

যন্ত্র আলোকপ্রভা বিষয়ে গবেষণার রাস্তা খুলে দিল। ১৯৫৪ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক ক্রুস্টালোগ্রাফি কনফারেন্সে অধ্যাপক বসু এই যন্ত্র তৈরির কাজের বিবরণ দেন। পরে এই রকম যন্ত্র বিদেশে তৈরি হয়।”

কলকাতায় এসে কিছুকাল তিনি জৈব রসায়নের কাজে মগ্ন হলেন। কুইনাইন ও এমিটিন সংশ্লেষণের কাজ। ১৯৪৯ সালে ট্রান্সিসটরের আবির্ভাব হল, যার প্রধান উপকরণ হল জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের ক্রুস্টাল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অধ্যাপক বসু সহপাঠী পুলিনবিহারী সরকারের সাহায্যে ১৯৫০ থেকে গন্ধক-জাতীয় খনিজের মধ্যে জার্মেনিয়মের অনুসন্ধান চালালেন। অবশেষে নেপালে ফেলেরাইটের ভেতর জার্মেনিয়মের সন্ধান পাওয়া গেল আর কিছু পরিমাণ নিষ্কাষণ সম্ভব হল। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ১৯৫০-এ বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পত্রিকায়। এই সময়ে তাপালোকপ্রভা ছাড়াও কোমল এক্স-রে বর্ণালী ও মৃত্তিকার খনিজের প্রকৃতি বিশ্লেষণের কাজ হত অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে আবার অধ্যাপক বসু তাঁর আশ্চর্য গাণিতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বে পর-পর পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন কয়েকটি নাম-করা ফরাসী পত্রিকায়।

আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণের বলকে একটা জ্যামিতিক ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষেত্রর বিভিন্ন অংশের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন-সংক্রান্ত সমীকরণগুলিই মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে সব খবর দেয়। নানা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব দিয়ে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া জগতে তড়িৎ-চৌম্বক বলও আছে। সে বল এই-সব সমীকরণের আওতায় আসে না। এই বলকেও যুক্ত করে একটা একীকৃত ক্ষেত্রর সমীকরণের সন্ধান এবং সমাধানের ইচ্ছেতে আর চেষ্টায় আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ২৫ বছর অতিবাহিত করেছেন। এই তত্ত্বকে ‘ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি’ (unified field theory) বলা হয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে এ কাজ আকৃষ্ট করেছে। শ্রয়েডিঙ্গার, কাল্যুজা, এডিংটন (Eddington), ওয়েইল (Weyl)— সকলেরই মনে

হয়েছে এ-গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা।

এই স্রোতের টান সত্যেন্দ্রনাথের কাছেও গিয়ে পৌছল যখন তিনি জানতে পারলেন এই পথের এক ধাপে কিছু সমীকরণের সমাধান অত্যন্ত দুরূহ বলে আটকে আছে। ৬৪ সমীকরণ[১]— যার সম্বন্ধে শ্রয়েডিঙ্গার বলেছেন 'এর সম্পূর্ণ সমাধান এতই দুরূহ যে, যে চেষ্টা না করেছে সে বুঝতে পারবে না'।

এই সাবধান-বাণীকে অগ্রাহ্য করে ৬০ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ একাগ্রভাবে লেগে পড়লেন এই কাজে— এবং আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ধাপে ধাপে সরলীকরণ করে এক অভিনব প্রক্রিয়ায় সেই ৬৪ সমীকরণের সম্পূর্ণ নিখুঁত সমাধান করলেন। তার পর এই তত্ত্বের নানা দিক নিয়ে আরো চারটি গবেষণা-পত্র লিখলেন। আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড থিয়োরি অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ সফল রূপ পায় নি। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বর মতো পরীক্ষিত বাস্তব ঘটনার সঙ্গে থাপ খায় নি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর আইনস্টাইন চিঠি লেখেন, "তুমি এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়েছ বলে আমি খুশি হয়েছি।" অল্প-সংখ্যক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কাজ করছেন। এ পথ ঠিক না বেঠিক এ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চিত মন্তব্য করেন নি। তাঁর নিজস্ব কিছু মত ছিল। ১৯৫৫-তে একটি 'আন্তর্জাতিক' আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে সে-বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আলোচনা-সভার আগেই সে বছর আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। ঠিক আইনস্টাইনের নির্দেশিত পথে না হলেও কতকটা সেই একই ধরনের প্রেরণা নিয়ে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আবদুস সালাম এবং মার্কিন অধ্যাপক স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (Weinberg) তড়িৎ-চৌম্বক বিক্রিয়া এবং মৌল কণাদের মধ্যে দুর্বল বিক্রিয়া এই দুই ধরনের বলের একটা সমন্বয় ঘটালেন নতুন তত্ত্বের ভিতর দিয়ে। সেই কাজের জন্য এঁরা ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক বসু প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন আলোচনা-সভায় আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের নানা দেশে গেছেন।

---

১ *Proceedings of the Royal Irish Academy*, Vol. 51, p. 166.

১৯৬২ সালে তিনি সুইডেন, মস্কো ও টোকিওতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন।

৬

১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ অধ্যাপক বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে শান্তিনিকেতনে থাকেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প -রসিক— সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত অপূর্ব সমন্বয়ধর্মী এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। অধ্যাপক বসু চিরকাল রবীন্দ্র-অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। রবীন্দ্রনাথ-পরিচালিত বিভিন্ন সাহিত্যবাসরের পেছনের সারিতে বসে আগ্রহী শ্রোতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য এগিয়ে যান নি। রবীন্দ্রনাথের জার্মানী ভ্রমণকালে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হবার পর আইনস্টাইন ভারতের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর খবর জিজ্ঞাসা করেন। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। শেষ জীবনে লেখা বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক অপূর্ব গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মানুষ অবাক হয় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্কৃত ভাষায়, শাস্ত্রে, কাব্যে অপূর্ব জ্ঞানের সাবলীল অভিব্যক্তি দেখে, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, দর্শন, অর্থশাস্ত্র যে-কোনো বিষয়ে আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তৃতা শুনে, সংগীতশাস্ত্র, চারুকলা, কারু-শিল্প সব-কিছুতেই তাঁর জ্ঞান দেখে। তা ছাড়া ছোটো-বড়োর ভেদাভেদবিহীন সহজ সরল ব্যবহার সকলকে আকর্ষণ করল।

একবার এক দুঃস্থ কর্মী মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে এলে তিনি অফিসের একজন কর্মীকে বললেন পকেট থেকে টাকা দিয়ে দিতে। উপাচার্যর ঝোলানো জামার পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে দেওয়াতে তিনি বললেন, "বড়ো কিপ্টে তো! যা আছে দিয়ে দে!"

"৩০০ টাকা আছে যে!"

"তাই দে। আজকালকার দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে কত খরচ হয় জানিস না!"

শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা কিছুদূর এগিয়ে দিলেন। রান্না-ঘরের আবর্জনা থেকে গ্যাস তৈরি করে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের প্ল্যান দিয়েছিলেন। সব-কিছু কার্যকর হয় নি। কিছু ভুল বোঝাবুঝিও হল। তিনি কিন্তু কারো ওপর কোনো রাগ রাখেন নি। কোনো বিষয়ে ক্ষোভ রাখেন নি।

এর পর ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত জাতীয় অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ছিলেন। খয়রা ল্যাবরেটরিতে তাঁর পুরনো ঘর এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে একটি ঘর ঠিক করে রাখা হল। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে কলকাতায় ফিরে পেয়ে আনন্দিত হল।

এই পর্যায়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে তত্ত্বীয় পদার্থবিত্তায় মৌল কণা বিষয়ে গবেষণা করছিলেন পূর্ণাংশু রায়, পার্থ ঘোষ ও সলিল রায়। তা ছাড়া ফলিত গণিতের যে-সব গবেষকরা আগেও তাঁর সঙ্গে সর্বদা আলোচনা করতেন— মহাদেব দত্ত, পরিমল ঘোষ, গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল সেনগুপ্ত, তপেন রায়— এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে আলোচনা করতে আসতেন। খয়রা গবেষণাগারে যাঁরা পরীক্ষামূলক গবেষণা করতেন তাঁরাও পরামর্শ নিতেন।

প্রবীণ অধ্যাপক শ্যামদাস চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৭১ থেকে নিয়োজিত করলেন বক্রেশ্বরের তাপকুণ্ড থেকে হিলিয়ম গ্যাসের সন্ধান করতে। অধ্যাপক বসুর নির্দেশে গ্যাস সংগ্রহ ও বিশুদ্ধিকরণের কাজ শুরু হয় এবং অতি সূক্ষ্মভাবে বিশুদ্ধতা নিরূপণের যন্ত্র গড়ে তুলে এই অতি প্রয়োজনীয় গ্যাসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা ও কলকাতায় একটা পরিচিত দৃশ্য দেখা যেত, পাতার পর পাতা অঙ্ক-কষা আর বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া। কিছু কিছু কাজ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতেন। সে খাতাগুলোও একে একে হারিয়ে যেত। এমন লাভক্ষতির হিসাববিহীন নির্লিপ্ত মানুষ পৃথিবীতে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গণিতের দিক্‌পাল গাউস্ (Gauss) ১৯ বছর বয়স থেকে নোটবই-এর পাতা বোঝাই করে গণিতের নতুন নতুন পথ অর্ধসমাপ্ত বা সম্পূর্ণ অবস্থায় কষে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর সে-সব মুদ্রিত হলে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে জীবিতকালেই কেউ নতুন কিছু করলেই ভাবত গাউসের সেটা আগেই কষা আছে।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হ্যালী (Haley) নানা পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান না পেয়ে নিউটনকে জিজ্ঞাসা করলেন দূরত্বের বর্গানুপাতে বল কমে গেলে সূর্যের চার দিকে একটি গ্রহের কিভাবে ঘোরা উচিত— নিউটন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'উপবৃত্তাকারে'। হ্যালীর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে নিউটন জানালেন পাঠ্যাবস্থায় কষে দেখেছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধির মূল সূত্র আবিষ্কার করে তিনি কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বসেছিলেন। হ্যালীর প্ররোচনায় নিউটন তা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' প্রণয়ন করেন।

ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে সত্যেন্দ্রনাথ সব চেয়ে বেশি আত্মনিয়োগ করেন মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচারের জন্য। আগে ছাত্রাবস্থায় 'মনীষা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ঢাকাতেও প্রকাশ করেছিলেন 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা। এম. এস্‌সি. ক্লাসে প্রাঞ্জল বাংলায়, কোনো নোটের সাহায্য না নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ সাবলীল ভাবে পদার্থবিজ্ঞানের সৌন্দর্য মেলে ধরতেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে। একটার-পর-একটা সাদা পাতা টেনে নিয়ে ভরিয়ে তুলতেন। গোটা গোটা পরিষ্কার অক্ষরে গড়ে তুলতেন অঙ্কের সূত্র।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তুললেন চাঁদা তুলে কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে। শেষ জীবনে এই বিজ্ঞান পরিষদ আর তাঁর পরিচালিত বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' নিয়ে অক্লান্তভাবে মগ্ন ছিলেন।

বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার বিরোধিতার উত্তরে বলেছেন, "যাঁরা বলেন যে ইংরেজী যদি কম শেখানো হয়, তা হলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে—

যার মধ্যে দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস— তাঁরা মনে করছেন যে চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে, যেটা কেবল উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন, সেই রকম ভাবে নীচের অজ্ঞ লোকেদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

"এটা ঠিক যে, দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বোঝায়, শুধুমাত্র শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো সে দেশকে উন্নত বলা যাবে।

"... স্বাধীনতার যা কিছু সুফল, তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের লোকের সকলের কাছে পৌঁছয়...।" তিনি ভাবতেন কয়েকজন মেধাবী বিজ্ঞানী নয়, দেশের সব লোক যখন বিজ্ঞান চিন্তা করবে তখনই দেশে বিজ্ঞান দানা বাঁধবে। অনেকটা জমিতে বীজ ছড়ালেই ভালো ফসল ফলবে।

জাপান-সফরে গিয়ে দেখলেন পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় রশ্মির কুফল সম্বন্ধে ভারতীয় দুই বিজ্ঞানীর ইংরেজি প্রবন্ধ জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছে আর জাপানের জনসাধারণের মধ্যে তা বহুল পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। তিনি ফিরে এসে লিখলেন, "...তবু আমাদের দেশে ঐ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের সম্পর্কে।"

বহুদিন আগে গ্যালিলিও বুঝেছিলেন বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, শক্তিশালী করতে হলে মাতৃভাষায় জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া কত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও এমন তাগিদ অনুভব করে সত্যেন্দ্রনাথকে 'বিশ্বপরিচয়' অর্পণ করে বলেছিলেন : "এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য।" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে বলছেন, "যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও

মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।"

কয়েকজন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামের সঙ্গে যুক্ত করে একটা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার উচ্চমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবিতকালে। তিনি রাজী হন নি। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতরণ করার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তুলতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। ১৯৬৯ সালে গোয়াবাগানে পরিষদের নিজস্ব ভবনও তৈরি হল।

ভালো ভালো ছাত্রদের জড়ো করে প্রতিষ্ঠান করতে চান নি। তারা তো পথ খুঁজে নেবেই। যাদের বাধা আছে তাদের দেখবে কে? শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সেই কাজ হাতে নিলেন। শেষ বয়সে ঈশ্বর মিল লেনের পৈতৃক বাড়ির বাইরের ঘরে খাটের ওপর বসা শুভ্রকেশ অধ্যাপককে দেখা যেত— চারি দিকে বই-খাতার মাঝে ক্রমাগত অঙ্ক কষতে। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে যে যখন যে-কোনো দরকারে আসত সহাস্য অভিবাদন শুনত, "আয়, বোস্।" চিন্তার সূত্র ছিন্ন হত না। তাদের সঙ্গে কথা ফুরোলে আবার সেই অঙ্ক কষতেন।

কখনো বা ফরাসী, জার্মান গল্প বাংলায় অনুবাদ করতেন। কখনো বা চীন দেশে কি ঘটছে বা সারা পৃথিবীতে মানুষের নানা সমস্যা কি সে সম্বন্ধে পড়াশুনা, চিন্তা করতেন— লিখতেন।

প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতের সামান্য ভুলও সহ্য করতেন না। চুলচেরা তর্ক করতেন। কিন্তু নবীন শিক্ষার্থীর সব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অপরিসীম ধৈর্য। একবার একটি ১৪।১৫ বছরের ছেলে রেডিয়ো টেকনিক সম্বন্ধে একটা বই লিখেছিল। তিনি তাতে ভূমিকা লিখে দিলেন। পরে একজন এসে বলল, "একি লিখেছে ভুলভাল কথা, আপনি ভূমিকা লিখে দিলেন?" উত্তর হল, "ও তো একটা ছোটো ছেলে লিখেছে, তুমি

ঠিকঠাক লেখো, তোমাকেও লিখে দেব।" ঠিকঠাক করে তার অবশ্য লেখা হয় নি।

নানা ধরনের লোক আসত। গল্প, আনন্দ বিতরণ, খাওয়ানো আর জ্ঞানচর্চা সবই চলত স্বভাবসিদ্ধ রূপে। আপাতদৃষ্টিতে ঢিলেঢালা ভাব হলেও একটা মূলগত নিয়মানুবর্তিতা ছিল। নিজের বিছানা নিজে করতেন। খুব ভোরে উঠে পোষা বেড়ালদের গুঁড়ো দুধ ঘন করে গুলে খাওয়াতেন। তার পর চা করে মেয়েদের মধ্যে যে-মেয়েটি মানসিক অসুস্থ, তাকে দিয়ে নিজে খেতেন, এর পর নিজের পড়াশুনা করতে বসতেন। টাকা যা হাতে থাকত তা লোকের দুঃখ দূর করার একটা উপকরণ ভাবতেন। যে যা দরকারে চাইত— পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে দিতেন। পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলের স্নেহশীল পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের ওপর শাসনের বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সকলেরই সহজ সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে।

অধ্যাপক বসু কলকাতা, এলাহাবাদ, যাদবপুর, দিল্লী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি পান। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে 'বিজ্ঞান-ভাস্করম্' উপাধি পান। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পান। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

৭

সারা দেশ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আশি বছরের জন্মোৎসবে মেতে গেল ১৯৭৪-এর ১ জানুয়ারি। বক্তৃতা, অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি চলল কিন্তু একমাস পরেই কয়েকদিনের অসুস্থতার পর এই আশ্চর্য সৃজনশীল জীবনের অবসান হল ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। এক সপ্তাহ আগে অসুস্থ অবস্থায় দুটি ছাত্রর অনুরোধে ১৯২৪ সালে লেখা দ্বিতীয় গবেষণা-পত্র অনুবাদ করে বুঝিয়েছেন আর বর্তমানে আবিষ্কৃত কিছু কিছু মৌল কণার ক্ষেত্রে তার কোনো প্রয়োগ হয় কি না দেখতে

বলেছেন। মৃত্যুর দু দিন আগে নাতিকে বললেন অবশ হাতের কবজি ধরতে— যে হাত সারাজীবন অনেক অঙ্ক কষেছে সেই হাতে করলেন মৌলিক সংখ্যার পরম্পরার সাধারণ নিয়ম সন্ধানের অসমাধিত সমস্যা সম্পর্কে শেষ লেখা।

বন্ধু মার্ক বললেন, "আমাদের অতি প্রিয় আশ্চর্য মানুষ! সে শুধু সকলের ভালো করতে জানত, শুধু সুন্দর কাজ জানত! তাকে আমরা বলতাম আমাদের বুদ্ধ!"

বিজ্ঞান কলেজের বড়ো বড়ো থামের আড়ালে বসানো আছে তারকনাথ পালিত আর রাসবিহারী ঘোষের মর্মর মূর্তি— যাঁরা অনেক আশা নিয়ে সারাজীবনের সঞ্চয় দান করেছেন ভারতীয়দের বিজ্ঞানশিক্ষার পত্তন করতে। এইখানে বহু বছর আগে আশুতোষের প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সদ্য পাসকরা যুবক সত্যেন্দ্রনাথ আর বন্ধু মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, "আমরা নিশ্চয়ই পারব গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান শেখাতে।"

মনে পড়বে মাথাভরা সাদা চুল ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর, "কই রে! তোদের যন্তর চলছে? কাজ হচ্ছে?" ঘরে ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কাঁধের ওপর স্নেহস্পর্শ। শত শত ছাত্রছাত্রীর ওপর রইল সেই কাজ সফল করার দায়িত্ব!

—

2/2/1974.
সকাল

মৌলিক সংখ্যা-পরম্পরার সাধারণ নিয়ম সন্ধানের অসমাধিত সমস্যা সম্পর্কে

সত্যেন্দ্রনাথের শেষ লেখা

জীবনপঞ্জী

১ জানুয়ারি ১৮৯৪ - ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

১৮৯৪ : ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ঈশ্বর মিল লেনের পৈতৃক গৃহে জন্ম।

১৯০৯ : হিন্দু স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার।

১৯১১ : প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস্‌সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ।

১৯১৩ : প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিত অনার্সে শীর্ষ স্থান অধিকার।

১৯১৪ : বিবাহ।

১৯১৫ : এম. এস্‌সি. পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে প্রথম স্থান অধিকার।

১৯১৭ : স্যার আশুতোষের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও মিশ্র গণিতের অধ্যাপক রূপে যোগদান।

১৯২১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীডার রূপে যোগদান।

১৯২৪ : 'বোস সংখ্যায়ন' সংক্রান্ত বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা-পত্র আইনস্টাইন-কর্তৃক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য লাভ করে ইউরোপ গমন। ফ্রান্সে মাদাম কুরী এবং মরিস দ্য ব্রগলীর গবেষণাগারে কিছুকাল গবেষণা।

১৯২৫ : বের্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা এবং উইলহেল্‌ম কাইজার ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ্যার সাপ্তাহিক সেমিনারে যোগদান।

১৯২৬ : স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ও বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদ লাভ।

১৯২৯ : মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে পদার্থবিদ্যা ও গণিত শাখার সভাপতি।

১৯৩৭ : রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ।

১৯৪৪ : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে মূল সভাপতি-পদে বৃত।

১৯৪৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে বৃত।

১৯৪৮ : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৫১ : UNESCO-র আহ্বানে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্যে ভারতের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্যারিসে গমন।

১৯৫২-৫৮ : রাষ্ট্রপতি-মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য।

১৯৫২ : কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি।

১৯৫৩ : বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণে বুদাপেস্ট গমন, প্যারিস, কোপেন-হেগেন, জুরিখ, প্রাগ ও মস্কো ভ্রমণ।

১৯৫৪ : প্যারিসে আন্তর্জাতিক ক্রিস্টালোগ্রাফি সম্মেলনে যোগদান। ভারত সরকার -কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত।

১৯৫৫ : ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের আমন্ত্রণক্রমে প্যারিসে গমন। জুলাই মাসে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন সহরে আয়োজিত 'আপেক্ষিকতাবাদের ৫০ বছর' পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৬ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক-পদ থেকে অবসর গ্রহণ ; বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে যোগদান। ব্রিটিশ বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির আহ্বানে ব্রিটেনে গমন।

১৯৫৭ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

১৯৫৮ : রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। এই উপলক্ষে প্যারিস হয়ে লণ্ডন গমন।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপক রূপে মনোনীত। ভারত সরকার -কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক-পদে বৃত। জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি।

১৯৬১ : বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত।

১৯৬২ : ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট -কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান। মে মাসে সুইডেনে বিশ্বশান্তি সংসদের প্রস্তুতি কমিটির সম্মেলনে এবং সেপ্টেম্বরে মস্কোতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান। আগস্ট মাসে টোকিওতে 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে যোগদান। অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদে 'আংরেজি হঠাও' সম্মেলনের উদ্বোধক।

১৯৬৩ : মার্চ মাসে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ প্রদান। জুলাই মাসে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে ভারতীয় বিজ্ঞানীদলের প্রতিনিধিরূপে কায়রো গমন।

১৯৬৪ : সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে ১ জানুয়ারি মহাজাতি সদনে দেশবাসী-কর্তৃক সংবর্ধনা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় -কর্তৃক 'বিজ্ঞান-ভাস্করম্' উপাধি প্রদান।

১৯৭৪ : ১ জানুয়ারি সারা দেশে ৮০ বছরের জন্মোৎসব পালন।
৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নির্বাচিত রচনাপঞ্জী

গবেষণা-পত্র

1. On the influence of the finite volume of Molecules on the equation of State, (Jointly with M. N. Saha), *Philosophical Magazine*, vol. 36, 1918, p. 199
2. The Stress-equations of Equilibrium, *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 10, 1919, p. 117
3. On the Horpolhode, *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. 11, 1919, p. 21.
4. On the equation of State, (Jointly with M. N. Saha), *Phil. Mag.*, ser. 6, vol. 39, 1920, p. 456,
5. On the deduction of Rydberg's Law from the quantum theory of Spectral Emission, *Phil. Mag.* vol. 40, 1920, p. 619.
6. Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese, *Zeits. für Physik*, Bd. 26, 1924, p. 178.
7. Waermegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie, *Zeits. für Physik*, Bd. 27, 1924, p. 384.
8. On the complete moment-coefficients of the D^2-Statistics, *Sankhya : The Indian Journal of Statistics*, vol. 2, 1936, p. 385.
9. On the moment-coefficients of the D^2-Statistics and certain integral and differential equations connected with the multivariate normal population, *Sankhya : I. J. S.*, vol. 3, 1937, p. 105.
10. Anomalous Dielectric Constant of Artificial Ionosphere, (Jointly with S. R. Khastgir). *Science*

and Culture, vol. 3, 1937, p. 335.

11. On the total Reflection of Electromagnetic Waves in the Ionosphere, *Indian Journal of Physics*, vol. 12, 1938, p. 121.
12. Studies in Lorentz Group, *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. 31, 1939, p. 137.
13. The Complete solution of the Equation :
$$\nabla^2\phi - \frac{\delta^2\phi}{c^2\delta t^2} - K^2\phi = -4\pi\rho\,(xyzt)$$
—(Jointly with S. C. Kar), *Proc. Nat. Inst. Sc. India*, vol. 7, 1941, p. 93.
14. Reaction of Sulphonazides with Pyridine : Salts and Derivatives of Pyridine-imine (Jointly with P. K. Dutta), *Science and Culture*, vol. 8, 1943, p. 48.
15. A note on Dirac Equations and the Zeeman Effect, (Jointly with K. Basu), *Ind. Jour. Phys.*, vol. 17, 1943, p. 302.
16. On an integral equation associated with the equation for hydrogen atom, *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. 37, 1945, p. 51.
17. Extraction of Germanium from Sphalerite collected from Nepal : Part 2 (Jointly with R. K. Datta) : *Journal of Scientific and Industrial Research*, vol. 9B, 1950, p. 271.
18. Les identities de divergence dans la nouvelle theorie unitaire, *Comptes rendus des Seances de la Academie des Sciences*, t. 236, 1953, p. 1333.
19. Une theorie du champ unitaire avec $\Gamma\mu \neq 0$, *Le Journal de physique et la Radium*, t. 14, 1953, p. 641.
20. Certaines consequences de l'existence du tenseur *g*

dans le champ affine relativiste. *Le Jour. de Phys. et la Rad.*, t. 14, 1953, p. 645.

21. The affine connection in Einstein's new Unitary field theory, *Annals of Mathematics*, vol. 59, 1954, p. 171.
22. A report on the study of Thermoluminescence, (Jointly with J. Sharma and B. C. Datta), Dr. D. M. Bose 70th Birthday Commemoration Volume : *Transactions of the Bose Research Institute*, vol. 20, 1955, p. 177.
23. Solution d'une equation tensorielle intervant dans theorie du champ unitaire, *Bull. Soc. Math. France*, vol. 83, 1955, p. 81.

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও রচনা

ইংরেজি

1. The Principles of Relativity (Original papers by A. Einstein and H. Minkowskei). Translated into English by M. N. Saha and S. N. Bose. With a historical introduction by Prof. P. C. Mahalanobis, University of Calcutta, 1920.
2. Tendencies in the Modern Theoretical Physics : Sectional President's Address. Indian Science Congress, Madras, 1929.
3. Recent Progress in Nuclear Physics, *Science and Culture*, vol. 2, 1937.
4. The Classical Determinism and the Quantum theory : General President's Address. Indian Science Congress, Delhi, 1944.

5. Search for new sources of power. 16th Acharya J.C. Bose Memorial Lecture, Bose Institute, 1954.
6. Man in Scientific Age. Address at the Symposium on 'Science and its position in Society'. Tokyo, Japan, 1962.

বাংলা

১. বিজ্ঞানের সংকট : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮। গ্রন্থকারে প্রকাশ : লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৪
২. আইনস্টাইন : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪২
৩. শক্তির সন্ধানে মানুষ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৪৮
৪. আইনস্টাইন : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৫৫
৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩
৬. শ্রদ্ধাঞ্জলি (আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি) : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর ১৯৫৮
৭. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অগস্ট ১৯৬১
৮. ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণে : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৬২
৯. মাতৃভাষা (হায়দ্রাবাদে ভাষা সম্পর্কিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ) : সাহিত্য পত্র, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৬২
১০. বৈজ্ঞানিকের সাফাই (প্রথম অংশ) : বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস : শ্রদ্ধাঞ্জলি (স্মারক গ্রন্থ), ১ জানুয়ারি ১৯৬৪
১১. বৈজ্ঞানিকের সাফাই (দ্বিতীয় অংশ) : পরিচয়, মাঘ ১৩৭০
১২. গণিতবিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৬৪
১৩. আজ থেকে চারশ' বছর আগে গ্যালিলিও : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৬৪
১৪. সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৩৮৭

স্বীকৃতি

এই পুস্তকের বিভিন্ন উদ্ধৃতি এবং ব্যক্তিগত আলোচনা নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে :

১. ঝিলিমিলি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১

২. বিজ্ঞানের সঙ্কট, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ১৯৬৪

৩. বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস : শ্রদ্ধাঞ্জলি ১ জানুয়ারি ১৯৬৪

৪. Satyendranath Bose 70th Birthday Commemoration Volume : January 1, 1968. Prof. S. N. Bose 70th Birthday Celebration Committee, 92 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta 9

৫. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৪

—